চয়নিকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
প্রকাশক—শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। ১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চয়নিকা

৩য় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ।

আদ্য য্যা-ধ্বনি দেখাইবার জন্য সর্ব্বত্র "ে"-কার ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে এ-ধ্বনি আর য্যা-ধ্বনির পার্থক্য নির্দ্দেশ করা সহজ হইবে। যেমন, ফেলো (=ফেলিও) আর ফেলো (=ফ্যালো=ফেলহ); দেখো (=দেখিও) আর দেখো (=দ্যাখো=দেখহ)।

প্রথম সংস্করণ	...	১৩১৬ (?)
দ্বিতীয় সংস্করণ	...	১৩২৩ (?)
৩য় পুনর্ম্মুদ্রণ	...	১৩২৬
৪র্থ পুনর্ম্মুদ্রণ	...	ফাল্গুন, ১৩৩০
৫ম পুনর্ম্মুদ্রণ	...	বৈশাখ, ১৩৩১
৩য় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ (৩২০০)		ফাল্গুন, ১৩৩২

মূল্য—
কাগজের মলাট—২৷৷৵০ ; বাঁধাই—৩।০
মোটা এন্টীক কাগজে—৪৷৷০ ; বাঁধাই—৫৲

আর্ট প্রেস—১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা,
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

সোনার তরী [১৩০০ সাল]

চৈতালি [১৩০৩ সাল]

কাহিনী [১৩০৬ সাল]

কল্পনা [১৩০৬ সাল]

বিষয় | পৃষ্ঠা

নৈবেদ্য [শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল]

উৎসর্গ [১৩২১ সাল]

স্মরণ [১৩০৯ সাল]

শিশু [১৩১০ সাল]

সন্ধ্যা

সন্ধ্যা

অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া,
নত করি স্নেহময় মোহময় মুখ
জগতেরে কোলেতে লইয়া,
মৃদু মৃদু ওকি কথা কহিস্ আপন মনে
মৃদু মৃদু গান গেয়ে গেয়ে,
জগতের মুখপানে চেয়ে

প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই কথা
নারিনু বুঝিতে।
প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই গান
নারিনু শিখিতে।

চোখে শুধু লাগে ঘুমঘোর,
প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর।
হৃদয়ের অতি দূর—দূর—দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
কে জানেরে কোথাকার উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।

কত না পুরান' কথা, কত না হারান' গান
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস,
সরমের আধ হাসি সোহাগের আধ বাণী
প্রণয়ের আধ মৃদু ভাষ
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে!
পূর্ণ করি অন্ধকার তোর
তা'রা সবে ভাসিয়া বেড়ায়,
যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙাচোরা জগতের প্রায়!
যবে এই নদীতীরে বসি তোর পদতলে,
তা'রা সবে দলে দলে আসে,
প্রাণেরে ঘেরিয়া চারিপাশে;
হয় ত একটি কথা, একটি আধেক বাণী
চারিদিক হ'তে বারেন্বার
শ্রবণেতে পশে অনিবার!
হয় ত একটি হাসি একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কভু ফোটে, কভু বা মিলায়!

আয় রে আয় বায়ু যা রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগৎ মাঝারেতে দে রে তা' প্রসারিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে যাইবি দিশে দিশে
সাগর পারে গিয়ে পূরবে যাবি মিশে;
লইবি পথ হ'তে পাখীর কলতান,
যূঁথীর মৃদু শ্বাস মালতী-মৃদুবাস,
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তা'রে!
আয় রে মেঘ, আয় বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যা রে।
কনক-পাল তুলে বাতাসে দুলে' দুলে'
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ-পারাবারে।

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি ত তোরি বুকে আমি ত হেথা নাই।
প্রভাত-আলো-সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠ হে ওঠ রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ-তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে—আমারে লও তবে।

পুলকে পূরে প্রাণ, শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি' এসেছে চরাচর।
এসেছে রবি শশী, এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।

পরাণ পূরে গেল, হরষে হ'ল ভোর,
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।
প্রভাত হ'ল যেই, কি জানি হ'ল এ কি!
আকাশ পানে চাই, কি জানি কারে দেখি!

প্রভাত-বায়ু বহে কি জানি কি যে কহে,
মরম-মাঝে মোর কি জানি কি যে হয়!
এসহে এস কাছে সখাহে এস কাছে,
এসহে ভাই এস, বসহে প্রাণ-ময়!

পূরব-মেঘ-মুখে পড়েছে রবি-রেখা,
অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো' মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে' যায়;
যেদিকে আঁখি চায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তা'রেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

অয়ি সন্ধ্যা, স্নেহময় তোর স্বপ্নময় কোলে
তাই আমি আসি নিতি নিতি,
স্নেহের আঁচল দিয়ে প্রাণ মোর দিস্ ঢেকে,
এনে দিস্ অতীতের স্মৃতি !

আজ আসিয়াছি সন্ধ্যা,— বসি তোর অন্ধকারে
মুদিয়া নয়ান,
সাধ গেছে গাহিবারে— মৃদুস্বরে শুনাবারে
দু চারিটি গান !
সে গান না শুনে কেহ যদি,
যদি তা'রা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা, তুই সযতনে গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস্ আঁধারের ছায়।
যেথায় পুরান' গান যেথায় হারান' হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেইখানে সযতনে রেখে দিস্ গান গুলি
রচে দিস্ সমাধি শয়ন !

(* ১২৮৮) —সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

তারকার আত্মহত্যা

জ্যোতির্ম্ময় তীর হ'তে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা!
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক হইয়া—
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্ত্তে সে গেল মিশাইয়া!
যে সমুদ্র-তলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী,
চির-নির্ব্বাপিত ভাতি—
শত মৃত তারকার
মৃতদেহ রয়েছে শয়ান,
সেথায় সে করেছে পয়ান!

কেন গো কি হয়েছিল তার?
একবার শুধালে না কেহ,
কি লাগি সে তেয়াগিল দেহ?

যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কি যে সে কহিত।
যত দিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কি তারে দহিত।

সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না !
জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ড, ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে !
তেমনি—তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত—দহিত তারে—দহিত কেবল !
জ্যোতির্ম্ময় তারা-পূর্ণ বিজন তেয়াগি,
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি !

তবে গো তোমরা কেন সহস্র সহস্র তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা ?
কহিতেছ—"আমাদের কি হয়েছে ক্ষতি ?
যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি।"

হেন কথা বলিও না আর !
সে কি কভু ভেবেছিল মনে—
এত গর্ব্ব আছিল কি তার
আপনারে নিভাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার ?

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধার সাগরে—
গভীর নিশীথে
অতল আকাশে !

(প্র—জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) —সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

মরণ

মরণরে,

তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান !
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজূট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান !
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান ।

মরণরে,

শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব, নিরদয় মাধব
তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম !
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখণ ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও ।
ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ ।

তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশী বজাওসি,
অনুখণ ডাকসি, অনুখণ ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা।

গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মূরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসেঁ
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি!"

(প্র—শ্রাবণ, ১২৮৮) —ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

কো তুঁহুঁ

কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় !
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখণ,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয় ।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় ।

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয় !
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় !

বাঁশরি ধ্বনি তুহ অমিয় গরলরে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরলরে,
উতল প্রাণ উতরোয় ।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় !

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল যুগ ছোঁয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়!

গোপ-বধূজন বিকশিত যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি, তব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেম-যতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে আপনা থোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়!

কো তুঁহুঁ কো তুঁহুঁ সবজন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণপর গোঁয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।

(* ১২৯২) —ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি!
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে',
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়।

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তা'র বাঁধন কেন?

ভাঙ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙিব পাযাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা!
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি'।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,

যত দেব' প্রাণ বহে' যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হ'য়ে আছে ভোর।
মেঘ গরজনে বরষা আসিবে,
মদির-নয়নে বসন্ত হাসিবে
কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি,
বিকশিত কাশ-কুসুম-রাশি।
দূরে দূরে কভু বাজিবে বাঁশি,
মূরছি পড়িবে মলয় বায়।
দুরু দুরু মোর দুলিবে হিয়া
শিহরিয়া মোর উঠিবে কায়।
এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা,
এত খেলা কোথা আছে,
যৌবন বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে!
অগাধ বাসনা, অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই,
জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়,
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,

তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই।

কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান!
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন!
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন!
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,
"কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয়!
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারা প্রাণ ঢালি দিয়া, জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!"

আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর,
এ কি কারাগার ঘোর!
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখী,
এয়েছে রবির কর!

(প্র—অগ্রহায়ণ, ১২৮৯) —প্রভাত-সঙ্গীত।

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মম, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা-সখী বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি
এসেছে ভাই বোন পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে 'ভাই ভাই' আঁখিতে আঁখি তুলি'।

সখারা এল ছুটে নয়নে তারা ফুটে,
পরাণে কথা উঠে, বচন গেল ভুলি'।
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে
দোলায় চড়ি তা'রা করিছে দোলাদুলি।
শিশুরে ল'য়ে কোলে জননী এল চলে',
বুকেতে চেপে ধরে' বলিছে 'ঘুমো ঘুমো'।
আনত দুনয়ানে চাহিয়া মুখপানে
বাছার চাঁদমুখে খেতেছে শত চুমো।

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কি গান!
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখ' আমার মুখপানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।

আপনি আসি ঊষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণ-কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে,
নিজের গলা হ'তে কিরণমালা খুলি,
দিতেছে রবি দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে,
জেনেছি ভাই ব'লে জগৎ চরাচরে।

(প্র—পৌষ, ১২৮৯) —প্রভাত-সঙ্গীত।

রাহুর প্রেম

শুনেছি আমারে ভালো লাগে না,
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া,
চিরকাল তোরে র'ব আঁকড়িয়া,
কঠিন লৌহ-ডোর।

তুই তো আমার বন্দী অভাগিনী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।

জগৎ মাঝারে, যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্তে শীতে, দিবসে নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে,
একবার তোরে দেখেছি যখন.
কেমনে এড়াবি মোরে।

চাও নাই চাও, ডাক' নাই ডাক',
কাছেতে আমার থাক' নাই থাক',
যা'ব সাথে সাথে র'ব পায় পায়,
র'ব গায়ে গায়েমিশি

এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্যসম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি।
অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া,
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
কখনো সমুখে, কখনো পশ্চাতে,
আমার আঁধার কায়া।

গভীর নিশীথে, একাকী যখন
বসিয়া মলিন প্রাণে,
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে
আমিও রয়েছি ব'সে তোর পাশে,
চেয়ে তোর মুখপানে।

যে দিকেই তুই ফিরাবি বয়ান,
সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,
যেদিকে চাহিবি, আকাশে আমার
আঁধার মূরতি আঁকা,
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে,
জগৎ পড়িবে ঢাকা।

দুঃস্বপ্নের মতো,—দুর্ভাবনা সম,
তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবস রজনী এমুখ দেখিব
তোমার নয়ন-নীরে।

বিশীর্ণ-কঙ্কাল চির-ভিক্ষা সম
দাঁড়ায়ে সমুখে তোর
দাও দাও ব'লে কেবলি ডাকিব,
ফেলিব নয়ন-লোর।

মোর এক নাম কেবলি বসিয়া
জপিব কানেতে তব,
কাঁটার মতন, দিবস রজনী
পায়েতে বিঁধিয়ে র'ব।

পূর্ব্ব জনমের অভিশাপ সম,
র'ব আমি কাছে-কাছে,
ভাবী জনমের অদৃষ্টের মতো
বেড়াইব পাছে-পাছে।

ঢালিয়া আমার প্রাণের আঁধার,
বেড়িয়া রাখিব তোর চারিধার
নিশীথ রচনা করি'।

কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন,
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী।

যেন রে অকূল সাগর মাঝারে
ডুবেছে জগৎ তরী ;
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী,
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুঝিস্ ছাড়াতে ছাড়িব না তবু,
সে মহাসমুদ্র পরি।

ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি,
কেবল দেখিবি মোরে,
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি
চাহিয়া দেখিছে তোরে।
সুবিজন পথে চলিতে চলিতে
সহসা কি ভয় গণি
সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি
আমার হাসির ধ্বনি।
হের', অন্ধকার মরুময়ী নিশা,
আমার পরাণ হারায়েছে দিশা,
অনন্ত এ ক্ষুধা অনন্ত এ তৃষা,
করিতেছে হাহাকার,
আজিকে যখন পেয়েছিরে তোরে,
এ চির যামিনী ছাড়িব কি ক'রে?
এ ঘোর পিপাসা যুগ যুগান্তরে
মিটিবে কি কভু আর?
জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
আশার পিছনে ভয়,
ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধ'রে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এই ত নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া র'বে।

(* ১২৯০) —ছবি ও গান।

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসিঅশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যেন গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে ব'লে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুখায়!

(* ১২৯১) —কড়ি ও কোমল

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের' ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি,
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন।
চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপর পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।
হের' তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মা'র মায়া পায় নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।

তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মা'র মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে, "মা গো এ কেমন ধারা?

এত বাঁশি এত হাসিরাশি,
এত তোর রতনভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন।"

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি
ভাই বোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই!

বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই!

স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে তো দেয় নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে তো দেয় নি নয়ন।"

আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ ?
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে র'বে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ?
ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশি,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশি।

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব !
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস !

প্র—কার্ত্তিক, ১২৯১) —কড়ি ও কোমল।

———

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান

দিনের আলো নিবে এল, সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও-পারেতে বিষ্টি এল, ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ-পারেতে মেঘের মাথায় এক শ' মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা, কোথায় বা সীমানা।
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়।
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে—
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান।"

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসি মুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে না যায় লেখাজোকা!

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান।"

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারি দিকের দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ ঝুপ ঝুপ—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্‌লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা?
শিবঠাকুরের বিয়ে হ'ল কবেকার সে কথা?
সে দিনো কি এম্‌নিতর মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বাজ বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা?
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে কি হ'ল তার শেষে?
না জানি কোন্‌ নদীর ধারে, না জানি কোন্‌ দেশে,
কোন্‌ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এল বান!"

(প্র—বৈশাখ, ১২৯২) —কড়ি ও কোমল।

মঙ্গল-গীত

এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা
দুলিতেছে আকাশ-সাগরে,—
দিন দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যা'ব খেলা ক'রে ?
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি,
অরণ্য বহিছে ফুল ফল,—
শত কোটী রবি তারা আমাদের ঘিরি
গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল ?

নাই কি মা মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা ?
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা ?
হৃদয়েতে শুষ্ক কি মা, উৎস করুণার
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন ?
জগৎ শুধু কি মা গো তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম-আসন ?

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোট ছোট কথা!
পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি
শকুনির মতো নির্ম্মমতা!
শুনো না করিছে কারা কথা কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে!

তুমি এস' দূরে এস', পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।
সযতনে ঝেড়ে ফেল' বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি!
নিমেষের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র রেণুজাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে।

শোন' শোন' উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল,
বিশ্বচরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল!
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠিছে সঙ্গীত কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল!

যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হ'তে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি জ্যোতির্ম্ময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ !
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে ল'য়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক !

২

চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয় ;
কথায় কথায় বাড়ে কথা !
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা !
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস' কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।

তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যেদিকে ফিরাবে তুমি দু'খানি নয়ন
সেদিকে হেরিবে সবে পথ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোখ,
পড়ুক দু ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক!
ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে,
করুণার অমৃত নির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
দয়া হবে মানবের পরে।

সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর!
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্য্যে হোক্ মানব সুন্দর
প্রেমে তব বিশ্ব হোক্ আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো?

(* ১২৯২) —কড়ি ও কোমল।

যৌবন-স্বপ্ন

আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিঃশ্বাস ?
বসন্তের কুসুম কাননে গোলাপের আঁখি কেন নত ?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হ'য়ে এসে, মরমের সরমে বিব্রত !
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ,
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে ;
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ ;
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে ;
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফোটে-ফোটে বকুল মুকুলে ;
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্ব্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

(* ১২৯৩) —কড়ি ও কোমল

বিবসনা

ফেল' গো বসন ফেল'—ঘুচাও অঞ্চল।
পর' শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ
সুর-বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা!
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা!
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ
সর্ব্বাঙ্গে মলয় বায়ু করুক্ সে খেলা।
অসীম নিলীমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো।
অতনু ঢাকুক্ মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক্ বিমল উষা মানব ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

(১২৯৩) —কড়ি ও কোমল।

দেহের মিলন

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মূরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সাগরে
চিরদিন তীরে বসি' করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

(* ১২৯৩) —কড়ি ও কোমল।

পূর্ণ-মিলন

নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ' চুরি ক'রে,
আঁখি হ'তে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হ'রে
অনন্তকালের মোর জীবন মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে,
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে।

(* ১২৯৩) —কড়ি ও কোমল।

চির-দিন

কোথা রাত্রি কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য্য তারা,
কেবা আসে কেবা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
কেবা হাসে কেবা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ কোথা গৃহ, কোথা পান্থ কোথা পথহারা।
কোথা খ'সে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হ'তে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
ব'হে যায় কালবায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে।
এত ভাঙা, এত গড়া আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কেবা, কোথা সিন্ধু, কোথা উর্ম্মি, কোথা তা'র বেলা ;—
গভীর অসীম গর্ভে নির্ব্বাসিত নির্ব্বাপিত সব।
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্ব্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশ-মণ্ডপে শুধু ব'সে আছে এক "চির-দিন"।

২

কি লাগিয়া ব'সে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি' ?
প্রলয়ের পর-পারে নেহারিছ কার আগমন ?
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ,
চির-বিরহীর মতো চির-রাত্রি রহিয়াছ জাগি ?
অসীম অতৃপ্তি ল'য়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিঃশ্বাস
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে ওঠে প্রলয়-বাতাস,
জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি'।

অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখীদের স্বর—
সহস্র জগতে মিলি' রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি' বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর,
হাসি কাঁদি ভালবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া,
আসি থাকি চ'লে যাই, কত ছায়া কত উপছায়া।

৩

তাই কি? সকলি মায়া? আসে থাকে আর মিলে যায়?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?
যুগযুগান্তর ধ'রে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায়ে?
এ ফুল চাহে না কেহ? লহে না এ পূজা-উপহার?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়?
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি' সিংহাসনে?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার?
যুগ-যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশি শুনে চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার?
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার?

৪

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ,
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হ'য়ে উঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে এ কি পিরীতির আদান প্রদান।
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথারে!
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে,—কোথা সেই অনন্ত জীবন।
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে!

(* ১২৯৩) —কড়ি ও কোমল।

ভুল ভাঙা

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তা'র ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না তো ধরা
অধর-কোণে,
আপনারে আর চাহে না লুকাতে
আপন মনে।
স্বর শুনে আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,

গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়ন লোর।
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
সরম চোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা,
জীবন-হত!
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না,
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর,
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর!

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই—
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি!
ঘুম নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিতেছে লাজ,
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর,
প্রেম গেছে শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে।
পর-দুখ-ভার সহেনাকো আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,
তবু আসি আমি, পাষাণ হৃদয়
বড় কঠোর।
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢুলে আসে,
ঘুমে কাতর।

(বৈশাখ, ১২৯২) —মানসী।

নিষ্ফল কামনা

বৃথা এ ক্রন্দন !
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো ;
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি !
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায় !

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।
তাই চেয়ে আছি।

প্রাণ মন সব ল'য়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে ;
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে,
তোমারে কোথায় পাব
তাই এ ক্রন্দন !

বৃথা এ ক্রন্দন !
হায় রে দুরাশা !
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস্,
এ কি দুঃসাহস !
কি আছে বা তোর,
কি পারিবি দিতে !
আছে কি অনন্ত প্রেম ?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব ?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,

এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি'
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির-সহচরে
চির রাত্রি দিন
একা অসহায় ?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্ব্বল,
ম্লান, ক্ষুধা-তৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়-ভারে পীড়িত জর্জ্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে ?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সঙ্গোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্ত্তনে
বিশ্ব জগতের তরে বিশ্বপতি তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি' ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?

লও তার মধুর সৌরভ,
দেখ' তার সৌন্দর্য্য-বিকাশ,
মধু তার কর' তুমি পান,
ভালোবাস', প্রেমে হও বশী,
চেয়োনা তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে।
চল' ধীরে ঘরে ফিরে যাই!

(১৩ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪) —মানসী

নারীর উক্তি

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্।
কেন কাঁদি বুঝিতে পার' না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধ'রে
ওই তব আঁখি-তুলে-চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি ওই কাছে আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চ'লে যাওয়া ?

কেন আন' বসন্ত-নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে, ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?

আছি যেন সোণার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান ?

মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
শীতের পরশে মৃদু রবির কিরণ।

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল,
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি',
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে, তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জান না তাহা—আমি তাহা জানি!

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে, কোন্ আকর্ষণ-ডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে!

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা
মাঝে মাঝে সব ফেলি' রহিতে নয়ন মেলি'
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা।

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।
নীরবে চরণ ফেলে চুপি-চুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখ' না,
সব কথা শুনিতে না পাও!
কাছে আস' আশা ক'রে আছি সারাদিন ধ'রে,
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চ'লে যাও।

দীপ জ্বেলে দীর্ঘ ছায়া ল'য়ে
ব'সে আছি সন্ধ্যায় ক'জনা,
হয় তো বা কাছে এস' হয়ত বা দূরে ব'স',
সে সকলি ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে ;
সর্ব্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি'
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে।

দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণ মন দেহ,
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ।

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালোবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কি কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ।
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই তিন।

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে !
মনে কি করেছ, বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ?

তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা,)
প্রেমে দেয় কতখানি, কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালোবাসা !

তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা,
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশিরাশি
এই দূরে-চলে-যাওয়া, এই কাছে-আসা।

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পারো না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা !

(২১ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪) —মানসী

পুরুষের উক্তি

যে-দিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবন-পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!

তখন উষার আধ' আলো
পড়েছিল মুখে দু'জনার,
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার!

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নৈরাশ্য-যাতনা,
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা!

আঁখি মেলি' যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো ব'লে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়,
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি

অনন্ত বাসর-সুখ যেন
নিত্য হাসি প্রকৃতি বধূর,
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ পাখীর অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভাণ অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে, প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়
প্রেম চিরদিন রয় এ চির জীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে চেয়েছিনু মুখে;
সুধাপাত্র ল'য়ে হাতে কিরণ কিরীট মাথে
তরুণ দেবতাসম দাঁড়ানু সম্মুখে।

পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে,
কি ললাট, কি নয়ন, কি শান্ত অধর।

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্দ্ধমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না আবরণ,

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কতবার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয়—নিয়ে
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য্য তোমার।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধো-চোখে দেখা
চুপি চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা।

অজানিত, সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল,
কোথা পথ, কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হ'তে উঠে হাসি, কোথা অশ্রুজল!

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে ল'য়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাহা তুলি, খেলাই আপনা ভুলি,
কি যে রাখি, কি যে ফেলি, বুঝিতে পারিনে!

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস,
কুসুমিত ছায়াতরুতলে;
জাগাই সরসীজল, ছিঁড়ি ব'সে ফুলদল
ধূলি সে-ও ভালো লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া,
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় ক'রে ওঠে হায় হায়,
অরণ্য মর্ম্মরি ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় এ কি সব ফাঁকি,
এই বুঝি আর কিছু নাই!
অথবা যে রত্ন তরে এসেছিনু আশা ক'রে
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

সুখের কাননতলে বসি'
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা,
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ,
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
সরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্ত্তি হ'য়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার?
সেই মায়া-উপবন কোথা হ'ল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুখাল' পাথার?

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়,
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা, এই নিশা, এই ক্ষুধা, এই তৃষা,
প্রাণপাখী কাঁদে এই বাসনার টানে!

আমি চাই তোমারে যেমন
তুমি চাও তেমনি আমারে,
কৃতার্থ হইব আশে গেলাম তোমার পাশে
তুমি এসে ব'সে আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্য্য-সম্পদ মাঝে বসি'
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা?
ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই
ভিখারিণী হ'ল যদি কমল-আসনা?

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল' না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে,
কখনো বসন্ত সমীরণে,
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপার রহস্যময়ী
আনন্দ মূরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

কাছে যাই, তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে,
কেন হেরি অশ্রুজল, হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে?

প্রাণ দিয়ে সেই দেবী পূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এস' থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্পঅর্ঘ্যভার।

(২৩ অগ্রহায়ণ, ১২৯৪) —মানসী।

একাল ও সেকাল

বর্ষা এলায়েছে তা'র মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারা দিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।

সে-দিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া,
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ চকিতদৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া

বিরহিণী মর্ম্মে মরা মেঘমন্দ্র স্বরে,
নয়নে নিমেষ নাহি,
গগনে রহিত চাহি',
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কা'রা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরাণে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন ;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন-শিথিল বেশ ;
সে-দিনও এমনিতর অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণ-তিমির।

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা,
সারাদিন, সারাবেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।

(২১ বৈশাখ, ১২৯৫) —মানসী।

বধূ

"বেলা যে প'ড়ে এল', জল্‌কে চল্‌ !"—
পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল,
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ-তল ?
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্‌ !"

কলসী ল'য়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
কোকিল ডাকে তীরে অমিয়-মাখা।
আসিতে পথে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি',
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
'করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।

প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে ব'সে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি'।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায়রে রাজধানী পাষাণ-কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিতে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে;
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে!
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে।
অবাক হ'য়ে সবে কারণ খোঁজে।
"কিছুতে নাহি তোষ, সে-ও তো মহাদোষ,
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে!
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে ব'সে নয়ন বোজে?"

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ্ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন ক'রে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের পরে ইঁট মাঝে মানুষ-কীট,
নাইকো ভালোবাসা নাইকো খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁগো!
উঠিলে নব শশী, ছাদের পরে বসি'
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!
হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা, আঁখিজলে রজনী জাগো!
কুসুম তুলি' ল'য়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো!

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।

নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি'।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো!
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো!

ডাক্‌লো ডাক্‌ তোরা, বল্‌লো বল্‌—
"বেলা যে পড়ে এল', জল্‌কে চল্‌।"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল্‌!

(১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) —মানসী।

ব্যক্ত প্রেম

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জ্জন ?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি,
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন,
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতাভরা,
সেই সরসীর তীর করবীর বন ;

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা,
কে জানিত কি ছিল এ প্রাণের আড়ালে!

বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা,
করিত দক্ষিণ বায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষায় ঘনঘটা, বিজুলি খেলায় ;
প্রান্তরের প্রান্ত দেশে মেঘে বনে যেত মিশে,
জুঁইগুলি বিকশিত বিকাল বেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহকাজ করি ;
সুখদুঃখ ভাগ ল'য়ে প্রতিদিন যায় ব'য়ে,
গোপন স্বপন ল'য়ে কাটে বিভাবরী।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয়তলে মাণিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

ভাঙিয়া দেখিলে ছি ছি নারীর হৃদয়,
লাজে ভয়ে থরথর ভালবাসা সকাতর,
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয় !

আজিও তো সেই আসে বসন্ত শরৎ।
বাঁকা সেই চাঁপাশাখে সোনা ফুল ফুটে থাকে,
সেই তারা তোলে এসে, সেই ছায়াপথ।

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল,
সেই তারা কাঁদে হাসে, কাজ করে, ভালবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে,
ভাঙিয়া দেখেনি কেহ হৃদয় গোপনগেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি',
পল্লবের সুচিক্কণ ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি' ধূলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি' দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কি বলিয়া!
ভুল ক'রে এসেছিলে? ভুলে ভালোবেসেছিলে?
ভুল ভেঙে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল,
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ' নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

এ কি নিদারুণ ভুল! নিখিল নিলয়ে
শত শত প্রাণ ফেলে ভুল কেন ক'রে এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে!

ভেবে দেখ' আনিয়াছ মোরে কোন্ খানে!
শত লক্ষ আঁখিভরা কৌতুক-কঠিন ধরা
চেয়ে র'বে অনাবৃত কলঙ্কের পানে।

ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা-বেশে?

(১২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) —মানসী

———

গুপ্ত প্রেম

তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে চাহিয়া দেখি তারে
কি ব'লে আপনারে দিব তায়?

ভালোবাসিলে ভালো যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালোবাসিতে।
মধুর হাসি তার দিক সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে।

যার নবীন-সুকুমার কপোলতল
রাঙিয়া উঠে প্রেম-লাজে গো!
যাহার ঢলঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো!

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালোবাসিতে মরি সরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

আহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরে ত ঝ'রে যাক শুকায়ে,
হৃদয়মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে

যত গোপনে ভালোবাসি পরাণ ভরি'
পরাণ ভরি' উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে শোভা কাহারে তো দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে যায়।
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে
মনের অন্ধকূপে থেকে যায়!

দেখ' বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি'
কুসুমে আপনারে বিকাশে।
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমেব আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরাণ কেঁদে তাই মরিছে

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরাণে আছে যাহা জাগিয়া,
তাহারে ল'য়ে সেথা দেখাতে পারিলে তা
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া।

আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে
প্রেমের রূপ সে তো সুমধুর।
(ধন সে যতনের শয়ন স্বপনের
করে সে জীবনের তমো-দূর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান্।

পাছে কুরূপ কভু তা'রে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহ মাঝে উদিয়া,
প্রাণের একধারে দেহের পরপারে
তাই তো রাখি তারে রুধিয়া।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তারে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত, নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা।

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মন-আশা দ'লে যাই,—
পাছে সে মোরে দেখে থমকি' বলে "এ কে!"
দু'হাতে মুখ ঢেকে চ'লে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভাবে, "এ-ও কি প্রেম জানে?
আমি তো এর পানে চাহিনি!"

তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে,
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে!

(১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) —মানসী।

দুরন্ত আশা

মর্ম্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালোমানুষ সেজে, বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে,
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে ক'সে।
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব,
জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোষে ব'সে।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হ'লেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট-গতি, গৃহের প্রতি টান ;
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালী-সন্তান !

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেছুয়িন !
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবন স্রোত আকাশে ঢালি'
হৃদয় তলে বহ্নি জ্বালি' চলেছি নিশিদিন ;
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে, সূর্য্যালোকে, সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হ'তে মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান্ যাহা, সঙ্গী পরাণের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ সিন্ধুমাঝে লুটে।

নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন-উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ, ঊর্দ্ধ নীলাকাশে !
থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি' বাজাও ও-কি সুর !
তব্‌লা-বাঁয়া কোলেতে টেনে বাদ্যে ভরপূর !
কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে পোলিটিকাল্ তর্ক করে,
জানালা দিয়ে পশিছে ঘরে বাতাস ঝুরুঝুর।
পানের বাটা, ফুলের মালা, তব্‌লা-বাঁয়া দুটো,
দম্ভভরা কাগজগুলো করিয়া দাও দূর !

কিসের এত অহঙ্কার, দম্ভ নাহি সাজে।
বরং থাকো মৌন হ'য়ে সসঙ্কোচ লাজে!
অত্যাচারে, মত্তপারা কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হ'য়ে রক্তধারা ফুটে কি দেহমাঝে?
অহর্নিশি হেলার হাসি তীব্র অপমান
মর্ম্মতল বিদ্ধ করি' বজ্রসম বাজে?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ, বিনীত জোড় কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি' ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি'
ব্যগ্র হ'য়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি' ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব্ব করো পূর্ব্বপুরুষের,
আর্য্য-তেজ-দর্পভরে পৃথ্বী থরথর!

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে মিষ্টহাসি টানি'
বলিতে আমি পারিব না তো ভদ্রতার বাণী!
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি' বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি'
প্রকাশহীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডীমাঝে শান্তি নাহি মানি।

(১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) —মানসী

সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন, আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে, পূরাতে হইবে আশ
অতি অসহন বহ্নি-দহন মর্ম্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্ক রাহু প্রতি পলে পলে জীবন করিছে গ্রাস!
পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি!

তোমারে কহিব লজ্জা-কাহিনী লজ্জা নাহিকো তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও, আঁখি নত করি' আমা-পানে চাও,
খুলে দাও মুখ আনন্দময়ী, আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি' তোমারে ভীষণ মধুর, আছ কাছে তবু আছ অতি দূর,
উজ্জ্বল যেন দেব-রোষানল, উদ্যত যেন বাজ।
জানো কি আমি এ পাপ আঁখি মেলি' তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা ওই মুখপানে ধেয়ে,
তুমি কি তখন পেয়েছ জানিতে? বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে নিশ্বাস রেখা-ছায়া?
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা আকাশ-উষার কায়া।
লজ্জা সহসা আসি' অকারণে বসনের মতো রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায় লুব্ধ নয়ন হ'তে?

মোহ চঞ্চল সে লালসা মম কৃষ্ণবরণ ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্‌গুন্‌ কেঁদে তোমার দৃষ্টিপথে ?

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত-রশ্মিসম ;
লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই ফুটেছে মর্ম্মতলে ;
নির্ব্বাণহীন অঙ্গার সম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হ'তে তা'রে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ !
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক্ !

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধ মূরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতি দূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনককিরণ-জ্বালা,
চকিত-তড়িৎ সঘন বরষা পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীম বিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু,
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও, মাগিতেছি অকপটে,
তিমির-তুলিকা দাও বুলাইয়া আকাশ-চিত্রপটে।
ইহারা আমারে ভুলায় সতত কোথা নিয়ে যায় টেনে !
মাধুরী-মদিরা পান ক'রে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায় আমার বাঁশরী কাড়ি'
পাগলের মতো রচি নব গান, নব নব তান ছাড়ি'
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া আপনি অবশ মন,
ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ বসন্তসমীরণ।

আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না-প্রবাহ সর্ব্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তা'র বেষ্টন করে কায়া।

চারিদিকে ঘিরি' করে আনাগোনা কল্প-মূরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া যেন বিভোরের মতো।
শ্লথ হ'য়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী বীণা খ'সে যায় পড়ি',
নাহি বাজে আর হরিনামগান বরষ বরষ ধরি'।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে।
বাড়ে তৃষা,—কোথা পিপাসার জল অকূল লবণ-নীরে!
গিয়েছিল, দেবী, সেই ঘোর তৃষা তোমার রূপের ধারে,
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা লোপ করো একেবারে।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূরতি পশেছে জীবন-মূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মূরতিখানি কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে জগৎ ছায়ার মতো।

যাক, তাই যাক! পারিনে ভাসিতে কেবলি মূরতি স্রোতে।
লহ মোরে তুলে আলোক-মগন মূরতি ভুবন হ'তে!
আঁখি গেলে মোর সীমা চ'লে যাবে একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে আমার বিজন বাস,
প্রলয় আসন জুড়িয়া বসিয়া রবো আমি বারো মাস।

থামো একটুকু! বুঝিতে পারিনে, ভালো ক'রে ভেবে দেখি!
বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার চিরকাল র'বে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ আনত আঁখি?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হ'তে সন্ধ্যা-কিরণ পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড় তিমির কেশে,
শান্তিরূপিণী এ মূরতি তব অতি অপূর্ব্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে অনন্ত নিশি মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া চিরকাল জেগে র'বে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ, দূর সরযূর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে চিরদিন যাবে দেখা!
সে নব জগতে কাল-স্রোত নাই, পরিবর্ত্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হ'য়ে চিরদিন র'বে চাহি'।

তবে তাই হোক্, হ'য়ো না বিমুখ, দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি!
হৃদয়-আকাশে থাক্ না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন র'বে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী!

(২৩, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) —মানসী।

বর্ষার দিনে

এমন্ দিনে তারে বলা যায়,
এমন্ ঘনঘোর বরিষায়।
এমন্ মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী;
আকাশে জল ঝরে অনিবার;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব!
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব!

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখি-নীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার ?
শ্রাবণ-বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু' কথা বলি যদি কাছে তা'র
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ?

আছে তো তা'র পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস !
আসিবে কত লোক কত না দুখশোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগত চ'লে যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে-কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে-কথা আজি যেন বলা যায়,
এমন্ ঘনঘোর বরিষায় !

(৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬) —মানসী :

ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবনমরণ হরণ করি' !

তোমার পাইনে কূল,
আপনা-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল !

উদয়শিখরে সূর্য্যের মতো সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়নসম ;
অগাধ অপার উদার দৃষ্টি নাহিক তাহার সীমা।

তুমি যেন ওই আকাশ উদার
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ-পূর্ণিমা।

তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার !

(২৬ শ্রাবণ, ১২৯৬) —মানসী

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবাব !
চিরকাল ধ'রে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার ;
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবা'র !

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মূরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে

আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে।
আমরা দু'জনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহবিধুর নয়ন-সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

আজি সেই চির দিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হ'য়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশিছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

(২ ভাদ্র, ১২৯৬) —মানসী

মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

সেদিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে
কি না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরুগুরু রব!
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝ'রে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোক রাশি।

সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
যোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা

গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি' প্রিয়-গৃহপানে ? বন্ধন-বিহীন
নবমেঘ-পক্ষপরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্পভরা,—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্তকেশে, ম্লান বেশে সজল-নয়নে ?

তাদের সবার গান তোমার সঙ্গীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি' বিরহিণী প্রিয়া ?
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি' ল'য়ে দিশ দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হ'তে দিশাহারা !
পাষাণ-শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি' মেঘদল
স্বাধীন-গগন-চারী, কাতরে নিশ্বাসি'
সহস্র কন্দর হ'তে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন পানে ; ধায় তা'রা ছুটি'
উধাও কামনা সম ; শিখরেতে উঠি'
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব-বরষার।

প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের পরে, করি বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা ; করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধছায়া ; করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের ;
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিণী সম।

কত কাল ধ'রে
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত-তারাশশী
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন।
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম
তব কাব্য হ'তে।

ভারতের পূর্ব্বশেষে
আমি ব'সে আজি ; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।

বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি' মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি; বেত্রবতীকূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে
বনস্পতি; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি' আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়

চকিত চকিত হ'য়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি',
বলে, "মাগো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি !"
কোথায় অবন্তিপুরী ; নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া ; সেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয়-চাঞ্চল্য ভুলি' ভবন-শিখরে
সুপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সুচিভিদ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নু-কন্যা যৌবন-চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রুকুটি-ভঙ্গি করি' অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে, করিতেছে খেলা
ল'য়ে ধূর্জ্জটীর জটাচন্দ্রকরোজ্জ্বল !

এই মতো মেঘরূপে ফিরি' দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি ; সেথা কে পারিত
ল'য়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে !
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে

নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা !
মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তা'রে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশি-রেখা
পূর্ব্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায় ।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হ'য়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য্যমাঝে একাকী জাগিয়া ।

আবার হারায়ে যায় ;—হেরি চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম, ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জ্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল উদ্দেশে ।
ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে !

(৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭) —মানসী ।

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা ব'সে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুর ধারা খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে-ঢাকা প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চ'লে যায়, কোনোদিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু'ধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেও যেথা যেতে চাও, যারে খুসি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী 'পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভ'রে।
এতকাল নদীকূলে যাহা ল'য়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে,
এখন আমারে লহ করুণা ক'রে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'!
শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী!

(ফাল্গুন, ১২৯৮) —সোনার তরী।

হিং টিং ছট্‌

(স্বপ্নমঙ্গল)

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,—
অর্থ তার ভাবি' ভাবি' গবুচন্দ্র চুপ।—
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে;
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়,
চোখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তা'রা এল এক বেদে,
"পাখী উড়ে গেছে" ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে;
সম্মুখে রাজারে দেখি' তুলি' নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়্‌থুড়ি,
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়্‌সুড়ি।
রাজা বলে "কি আপদ!" কেহ নাহি ছাড়ে,
পা ছু'টা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখীর মতন রাজা করে ঝট্‌পট্‌—
বেদে কানে কানে বলে—"হিং টিং ছট্‌।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।

শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ—এতই বিভ্রাট!
সারি সারি ব'সে গেছে কথা নাই মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

চারিদিক হ'তে এল পণ্ডিতের দল,
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল;
উজ্জয়িনী হ'তে এল বুধ-অবতংশ—
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি ল'য়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি' টিকিসুদ্ধ মাথা।
বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান;
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে উঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ।

চুপ ক'রে ব'সে থাকে বিষম সঙ্কট,
থেকে থেকে হেঁকে উঠে—"হিং টিং ছট্ !"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্র রাজ—
"ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ !
তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।"—
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশ কপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্ত্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্ত্তি।
ভূমিকা না করি' কিছু ঘড়ি খুলি' কয়—
"সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্‌পট্।"
সভাশুদ্ধ বলি' উঠে—"হিং টিং ছট্।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্ন শুনি' ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
"ডেকে এনে পরিহাস !" রেগেমেগে বলে।—
ফরাসী পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বল মুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি' বুকে,—

"স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে ;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।
অর্থ চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট
শুনিতে কি মিষ্ট আহা—'হিং টিং ছট্' !"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক ধিক—
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক !
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্কবিকার,
এ কথা কেমন ক'রে করিব স্বীকার !
জগৎ-বিখ্যাত মোরা "ধর্ম্মপ্রাণ" জাতি,
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে !—দুপুরে ডাকাতি !
হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ—
"গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক্।
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।"
সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ,
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ।
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্ম্মরাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি এল ফিরে।

পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্ব্বার উচ্চারিল—"হিং টিং ছট্‌!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

অতঃপর গৌড় হ'তে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খ'সে খ'সে পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়!
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে, "কি ল'য়ে বিচার?
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই চার;
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্‌ পালট্‌।"
সমস্বরে কহে সবে—"হিং টিং ছট্‌।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্নকথা শুনি' মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
"নিতান্ত সরল অর্থ অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার;—

ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ!
বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমাণ জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'হিং টিং ছট্'!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

সাধু সাধু সাধু রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে—"পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার!
দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হ'য়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল।"
হাঁপ ছাড়ি' উঠিলেন হবুচন্দ্র রাজ,
আপনার মাথা হ'তে খুলি' ল'য়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালীর শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে।
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু রাজ্য নড়ি' চড়ি' উঠে।
ছেলেরা ধরিল খেলা বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।

দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্‌,
সবাই বুঝিয়া গেল—"হিং টিং ছট্‌।"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্ব্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এস' ভাই, তোল' হাই, শুয়ে পড়' চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলই মিথ্যা সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান।

(১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) —সোনার তরী

পরশ-পাথর

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দ্বার ঝাঁপি'
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোৎ হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চালচুলা গায়ে মাখে ছাইধূলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারী হ'তে আরো দীনহীন,
তার এত অভিমান, সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর,
দশা দেখে হাসি পায় আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি' হেসে হ'ল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।
আকাশ রয়েছে চাহি' নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু ক'রে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।

সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনের ভালে,
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল,
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে ;—
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি'
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায়, কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
ক্ষ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

একদিন, বহুপূর্ব্বে, আছে ইতিহাস—
নিকষে সোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ ;
মিলি' যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপূর
এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে,
অতলের পানে চাহি' নয়নে নিমেষ নাহি
নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে ;
বহুকাল স্তব্ধ থাকি' শুনেছিল মুদে আঁখি
এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন ;
তার পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
করেছিল এ অনন্ত রহস্য মন্থন।
বহুকাল দুঃখ সেবি' নিরখিল লক্ষ্মীদেবী
উদিলা জগৎমাঝে অতুল সুন্দর।
সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু, বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন,
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।
আর সব কাজ ভুলি' আকাশে তরঙ্গ তুলি'
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত!
যত করে হায় হায়, কোনোকালে নাহি পায়,
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা ল'য়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর।
সেই মতো সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে,
"সন্ন্যাসীঠাকুর এ কি! কাঁকালে ওকি ও দেখি!
সোনার শিকল তুমি কোথা হ'তে পেলে?"
সন্ন্যাসী চমকি' ওঠে, শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
এ কি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন!
কপালে হানিয়া কর ব'সে পড়ে ভুমিপর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা,—

পাগলের মতো চায়, কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাস মতো নুড়ি কুড়াইয়া কত
ঠন্ ক'রে ঠেকাইত শিকলের পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি'
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ-পাথর।

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর, নুয়ে পড়ে দেহভার,
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘ পথ প'ড়ে আছে মৃতবৎ,
হেথা হ'তে কত দূর নাহি তার শেষ।
দিক হ'তে দিগন্তরে মরুবালি ধূ ধূ করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্ব্বদেশ।
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ ল'ভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর!

(১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) —সোনার তরী।

বৈষ্ণব-কবিতা

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান,
অভিসার প্রেমলীলা বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা; এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,— এ কি শুধু দেবতার?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা?
এ গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি' শুনি যদি তা'রি
দুয়েকটি তান,—দূর হ'তে তাই শুনে,
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি' উঠে; শুনি' সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর

আমাদের ধরা ;—মধুময় হ'য়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটীর-প্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে ;—সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি' মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি' নিজ মৌন ভালবাসা ;
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজভাষা,—
যদি তা'র মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেম-জ্যোতি,
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি ?

সত্য ক'রে কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত ? হেরি' কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি প'ড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে,
রেখেছিল মগ্ন করি' ? এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে ? আজ তা'র নাহি অধিকার

সে সঙ্গীতে ? তা'রি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তা'র ভাষা হ'তে তা'রে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন ?

আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার-
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্য-পথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি' কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার ; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলি' একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের দস্যু তা'রা

লুটে-পুটে নিতে চায় সব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বাসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
ব'হে যায়—তাই তা'রা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি' কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হ'তে
কলস ভরিয়া তা'রা ল'য়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটীরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর' দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ!
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন ব'সে।

১৮ আষাঢ়, ১২৯৯) —সোনার তরী।

দুই পাখী

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখী বলে, "খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখী বলে, "বনের পাখী, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখী বলে—"না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখী বলে—"হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।"

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি' বসি'
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তা'র
দোঁহার ভাষা দুই মতো।

বনের পাখী বলে, "খাঁচার পাখী ভাই,
বনের গান গাও দিখি !"
খাঁচার পাখী বলে, "বনের পাখী ভাই,
খাঁচার গান লহ' শিখি' ।"
বনের পাখী বলে—"না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,"
খাঁচার পাখী বলে—"হায়,
আমি কেমনে বন গান গাই ।

বনের পাখী বলে—"আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তা'র ।"
খাঁচার পাখী বলে, "খাঁচাটি পরিপাটি,
কেমন ঢাকা চারিধার ।"
বনের পাখী বলে—"আপনা ছাড়ি' দাও
মেঘের মাঝে একেবারে ।"
খাঁচার পাখী বলে, "নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখ' আপনারে ।"
বনের পাখী বলে—"না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই !"
খাঁচার পাখী বলে—"হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই !"

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে,
তবুও কাছে নাহি পায় ।

খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা,
কাতরে কহে, "কাছে আয়!"
বনের পাখী বলে—"না,
কবে খাঁচায় রুধি' দিবে দ্বার।"
খাঁচার পাখী বলে—"হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার।"

(১২৯৯) —সোনার তরী।

যেতে নাহি দিব

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি ; বেলা দ্বিপ্রহর ;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন বাতাসে ; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধ ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি'
ঘুমায়ে পড়েছে ; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম ;—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।
গিয়েছে আশ্বিন।—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূর দেশে
সেই কর্ম্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হ'য়ে
বাঁধিছে জিনিষপত্র দড়াদড়ি ল'য়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে ওঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল ক'রে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তা'র নাহি কাঁদিবার

একদণ্ড তরে ; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হ'য়ে ফিরে ; যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, "এ কি কাণ্ড !
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড
বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই
কি করিব ল'য়ে ? কিছু এর রেখে যাই
কিছু লই সাথে।"

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোনো জন। "কি জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে।—
সোনা-মুগ সরুচাল সুপারি ও পান ;
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারি খান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল ;
দুই ভাণ্ড ভাল রাই-সরিষার তেল ;
আমসত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ ;
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে ক'রে।"
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়,
বোঝাই হইল উঁচু পর্ব্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তা'র পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে ; কহিলাম ধীরে
"তবে আসি।" অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি'

অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।
বাহিরে দ্বারের কাছে বসি' অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের ; এতক্ষণ
অন্য দিনে হ'য়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে ; আজি তা'র মাতা
দেখে নাই তা'রে ; এত বেলা হ'য়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্ত দেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে
চুপিচাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"মাগো, আসি," সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়!"
যেখানে আছিল ব'সে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়!"
তবুও সময় হ'ল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হ'ল।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে
কে রে তুই, কোথা হ'তে কি শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্দ্ধাভরে—

"যেতে আমি দিব না তোমায় !" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধ'রে দুটি ছোটো হাতে,
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি' গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ,
শুধু ল'য়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ ?
ব্যথিত হৃদয় হ'তে বহু ভয়ে লাজে
মর্ম্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে,—শুধু ব'লে রাখা, "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি।" হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব !" শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ব্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভ'রে
দুয়ারে রহিলি ব'সে ছবির মতন,
আমি দেখে চ'লে এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুইধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো

নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিঃশ্বাস।

কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর,
"যেতে আমি দিব না তোমায়!" ধরণীর
প্রান্ত হ'তে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব! যেতে নাহি দিব!" সবে
কহে, "যেতে নাহি দিব!" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তা'রেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব!"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব'
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তা'রে
কহিতেছে শতবার, "যেতে দিব না রে!"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব!" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়!
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হ'তে;
প্রলয়-সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্রবাহু জ্বলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে

হুহু ক'রে তীব্রবেগে চ'লে যায় সবে
পূর্ণ করি' বিশ্বতট আর্ত্ত কলেরবে।
সম্মুখ-উর্ম্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিব না দিব না যেতে"—নাহি শুনে কেউ
নাহি কোনো সাড়া।
চারিদিক হ'তে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি'
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধ'রে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হ'ল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মতো
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্ব্বে কহিছে সে ডাকি'
"যেতে নাহি দিব।" ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে—"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে?
আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন আকুল,
এমন সকল বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর?"
এত বলি' দর্পভরে করে সে প্রচার

"যেতে নাহি দিব!"—তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চ'লে যায়
একটি নিঃশ্বাসে তা'র আদরের ধন,—
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব্ব নতশির।—তবু প্রেম বলে,
"সত্য ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি।" তাই স্ফীতবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্ব্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি'। মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশ'
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
প'ড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।
তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে

এত ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র ল'য়ে ; বেলা ধীরে যায় চ'লে
ছায়া দীর্ঘতর করি' অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্র জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি' দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।

(১৪ কার্ত্তিক, ১২৯৯) —সোনার তরী।

———

সমুদ্রের প্রতি

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি', নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তা'র
সুকোমল সুকৌশলে। এ কি সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি' যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি ফিরিয়া আসি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড়' বুকে
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে স্নেহ-গর্ব্বসুখে
আর্দ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি,—আদি অন্ত তাহার কোথা রে,
কোথা তা'র তল, কোথা কূল! বল' কে বুঝিতে পারে

তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তা'র সুগম্ভীর মৌন, তা'র সমুচ্ছল কলকথা,
তা'র হাস্য, তা'র অশ্রুরাশি !—কখনো বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে এসে ধরণীরে বক্ষে ধর' চাপি'
নির্দ্দয় আবেগে ; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি',
রুদ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকারি' উঠিতে চাহে কাঁদি',
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মতো তা'রে বাঁধি',
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তি মাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ' তা'রে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে ! পরক্ষণে মহা অপরাধীপ্রায়
প'ড়ে থাক তটতলে স্তব্ধ হ'য়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল ; ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে ; সন্ধ্যাসখী ভালবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপেচুপে
চ'লে যায় তিমির-মন্দিরে ; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি' ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে' ফুলে'।
আমি পৃথিবীর শিশু ব'সে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তা'র—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে—
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সে-ও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে

মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবীপরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক হ'তে দিগন্তরে যুগ হ'তে যুগান্তর গণি'—
তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা ; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া। দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্ব্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি'। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি' যেত মহা-সন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদিজননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতিসম উদিত হতেছে বারম্বার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তা'রি
ব্যাকুল করেছে তা'রে, মনে তা'র দিয়েছে সঞ্চারি

আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পূরে।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছিতোমাপানে; তুমি সিন্ধুপ্রকাণ্ড হাসিতে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে
আমার এ মর্ম্মখানি তোমার তরঙ্গ মাঝখানে
কোলের শিশুর মত।
হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব-ভাষা? জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস,
নাহি জানে কি যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা'
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত; স্নিগ্ধ মাতৃপানি
চিন্তাতপ্ত ভালে তা'র তালে তালে বারম্বার হানি,'
সর্ব্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তা'রে স্নেহময় চুমা,
বল তা'রে "শান্তি! শান্তি!" বল তা'রে,
"ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা!"

(১৭ই চৈত্র, ১২৯৯) —সোনার তরী।

মানস-সুন্দরী

আজ কোনো কাজ নয় ;—সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত—এস' তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে ব'স। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন,
তোমাতে আমাতে শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা,—
যতক্ষণে অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কি আশা মেটেনি প্রাণে, কি সঙ্গীতরব
গিয়েছে নীরব হ'য়ে, কি আনন্দসুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের ক্ষুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুখায়ে। এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক সৌম্য ম্লানকান্তি
জীবনের দুঃখদৈন্য অতৃপ্তির পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।

বীণা ফেলে দিয়ে এস', মানস-সুন্দরী,
দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও,—মৃণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্ম্মান্ত হরষে,—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধতনু মরি' যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে!
অর্দ্ধেক অঞ্চল পাতি' বসাও যতনে
পার্শ্বে তব; সুমধুর প্রিয় সম্বোধনে
ডাক' মোরে, বল' প্রিয়, বল' প্রিয়তম;—
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি' মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সঙ্গোপনে ব'লে যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরেস্তরে
সরসসুন্দর;—নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো; আনন্দ আভায়
বড় বড় দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,

নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দুজনে; যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি' উঠে, বসি' মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি'
হাসিয়ো নীরবে অর্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি;
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
ব'লে যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মতো, অর্দ্ধেক রজনী ধরি
কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি ; যদি গান
ভালো লাগে, গেয়ো গান ; যদি মুগ্ধ প্রাণ
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই র'ব প্রিয়া!
হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে ; অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মতো ; সন্ধ্যাতারা ধীরে
সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে
অরণ্যশিয়রে ; যামিনী শয়ন তা'র
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা র'ব চাহি'
অপার তিমিরে ; আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতলখানি,
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জনপ্রাণী

অসীম নির্জ্জনে ; বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি',
শুধু এক প্রান্তে তা'র প্রলয়-মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
দুটি হাত ত্রস্ত কপোতের মতো, দুটি
বক্ষ দুরুদুরু, দুই প্রাণে আছে ফুটি'
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালোবাসা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্যবিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্য্যের শশী,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যুথীবনে
বহু বাল্যকালে, দেখা হ'ত দুইজনে
আধ' চেনা শোনা ? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা মূর্ত্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণ-ধারে সদ্যঃস্নান করি'
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি,
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্ত্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি

দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি'
পাঠশালা-কারা হ'তে ; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য-ভবনে
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে ;
কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা ব'লে
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তা'র।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয়, দুটি কপোলের পরে
খেলিত অলক, দুটি স্বচ্ছ নেত্র হ'তে
কাঁপিত আলোক, নির্ম্মল নির্ঝর স্রোতে
চূর্ণরশ্মিসম। দোঁহে দোঁহা ভালো ক'রে
চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে
খেলাধূলা ছুটাছুটি দুজনে সতত,
কথাবার্ত্তা বেশবাস বিথান বিতত।
তারপরে একদিন—কি জানি সে কবে—
জীবনের বনে, যৌবন-বসন্তে যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হ'য়ে আপন সঙ্গীতে
চমকিয়া হেরিলাম—খেলাক্ষেত্র হ'তে
কখন অন্তর-লক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি' আছ মহিষীর মতো। কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া ? পুরদ্বারে

কে দিয়াছে হুলুধ্বনি ? ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষণ নব পুষ্পদল
তোমার আনম্রশিরে আনন্দে আদরে ?
সুন্দর সাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে
কি উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্লপথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হ'য়ে প্রবেশিলে চিরদিন তরে
আমার অন্তরগৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্য্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ ল'য়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জাআশাভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিক সয়
এত সুকুমার। ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসিঅশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধদৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছনীলাম্বরসম ; হাসিখানি স্থির,
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত, পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মত ; প্রীতিস্নেহ
গভীর-সঙ্গীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণ-বীণা তন্ত্রী হ'তে রনিয়া রনিয়া
অনন্ত বেদনা বহি'। সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হ'য়ে তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই অন্ত॥ কোন্ বিশ্বপার

আছে তব জন্মভূমি? সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম? এই যে বেদনা,
এর কোনো ভাষা আছে? এই যে বাসনা,
এর কোনো তৃপ্তি আছে? এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হ'য়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কি কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে? সৌন্দর্য্যপাথারে
যে বেদনা-বায়ু-ভরে ছুটে মনতরী,
সে বাতাসে, কত বার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হ'য়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল।
অভয়আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই, বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্য্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা!
কি বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর? কি কথা বুঝাতে চাও?
কিছু ব'লে কাজ নাই—শুধু ঢেকে দাও

আমার সর্ব্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি' লহ' গো সবলে
আমার আমারে ; নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিতে প্রহত,
সঙ্গীততরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপি' থরথর করি'।
নাইবা বুঝিনু কিছু, নাইবা বলিনু
নাইবা গাঁথিনু গান, নাইবা চলিনু,
ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে। শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সঙ্গীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়,
শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গপানে ; বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না। দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্ত্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।

মানসীরূপিণী ওগো, বাসনা-বাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কিগো মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ ল'য়ে

অনিন্দ্যসুন্দরী ? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জ্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহশয়ন ;
শরৎ-প্রত্যূষে উঠি' করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে,
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্য-ছায়ে উদাসিনী হ'য়ে
বসে থাক ; ঝিকিমিকি আলোছায়া ল'য়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকাল বেলায়
বসন বয়ন কর' বকুলতলায় ;
অবসন্ন দিবালোকে কোথা হ'তে ধীরে
ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবর-তীরে
করুণ কপোতকণ্ঠে গাও মুলতান ;
কখন অজ্ঞাতে আসি' ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে ; করি' দাও হৃদয় বিকল,
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি', অসীম আকাঙ্ক্ষারাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুতপদে উপহাসি

মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে।
কখনো মগন হ'য়ে আছি যবে কাজে
স্খলিত-বসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি'
চকিতে চমকি চলি' যায়;—জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়,—
মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের
মতো, বহুক্ষণ কাঁদি, স্নেহ-আলোকের
তরে, ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হ'তে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা,
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হ'তে নিঃশব্দে আসিয়া; অশ্রুনীর
অঞ্চলে মুছায়ে দাও, চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে,
নয়ন চুম্বন কর, স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও, না কহিয়া বাণী
সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন আবার
চ'লে যাও নিঃশব্দ চরণে!

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?

অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুরমূরতি ?
নদী হ'তে লতা হ'তে আনি' তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া,
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি' গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশভরে ? কি নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি ? কেমন কঙ্কণ
ধরিবে হু'খানি হাতে ? কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে ?
কচি কেশগুলি পড়ি' শুভ্র গ্রীবাপরে
শিরীষ কুসুমসম সমীরণভরে
কাঁপিবে কেমন ? শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধদৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয়—নব নীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে ! কি সঘন পল্লবের ছায়,
কি সুদীর্ঘ কি নিবিড় তিমির আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখবিভাবরী ? অধর কি সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব ? লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কি করিয়া মুকুলি বিকশি
অনিবার সৌন্দর্য্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি
নিঃসহ যৌবনে !

জানি, আমি জানি, সখি,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম-পথে,—দাঁড়াব থমকি,
নিদ্রিত অতীত কাঁপি' উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা!—জানি মনে হবে মম
চির-জীবনের মোর ধ্রুবতারাসম
চির পরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ!
আমার নয়ন হ'তে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হ'তে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে? আমাদের দুইজনে
হবে কি মিলন? দুটি বাহু দিয়ে বালা
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে? কখনো কি বক্ষ ভরি'
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদয়েশ্বরী
পারিব বাঁধিতে? পরশে পরশে দোঁহে
করি' বিনিময়, মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে? জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন,
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্য্যে তোমার? বাজিবে তোমার সুর
সর্ব্ব দেহে মনে? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল, প্রতি কাজে
র'বে তব শুভহস্ত দুটি, গৃহমাঝে

জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,
কল্পনার ছল? কার এত দিব্য জ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্ব্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্য্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি? মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছো, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তা'র
পূর্ণ করি' ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হ'য়েছো উদয়,—
তবু কোন মায়া-ডোরে চির-সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছো ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়।
তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে।
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।
রজনী গভীর হ'লো, দীপ নিবে আসে;
পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম আকাশে
কখন যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণ-রেখা

মিলাইয়া গেছে, সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে, শেষ ঘট পূর্ণ ক'রে
কখন বালিকা বধূ চ'লে গেছে ঘরে!
হেরি' কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি একাদশী তিথি
দীর্ঘপথ, শূন্যক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী,—
কখন গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মাঠপারে, কৃষি-পল্লী হ'তে নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটীরে
কখন জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যা-দীপখানি,
কখন নিভিয়া গেছে—কিছুই না জানি!
কি কথা বলিতেছিনু কি জানি, প্রেয়সী,
অর্দ্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি'
স্বপ্নমুগ্ধমতো। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তার? সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গভীর নিঃস্বনে!

এসো সুপ্তি, এসো শান্তি,
এসো প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহ টানি',—শোয়াও যতনে
মরণ-সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি-শয়নে!

(৪ পৌষ, ১২৯৯) —সোনার তরী

হৃদয়-যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো মোর
হৃদয় - নীরে ।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে ।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে ।
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে ।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো মোর
হৃদয় - নীরে ।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে ;
হেথা শ্যাম দূর্ব্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে ।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,
চাহিয়া বঞ্জুলবনে কি জানি পড়িবে মনে
বসি' কুঞ্জতৃণাসনে শ্যামল কূলে ।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে ।

যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহন-তলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি',
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি' উরসে গ'লে।
ঘুরে ফিরে চারিপাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কি ছলে।
যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহন-তলে।

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।

(১১ আষাঢ়, ১৩০০) —সোনার তরী।

বসুন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে !   ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চ'লে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে ; উত্তরে দক্ষিণে,
পূরবে পশ্চিমে ; শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে ; যাই পরশিয়া
স্বর্ণ-শীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে ; নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সঙ্গোপনে সুবর্ণ-লেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দুভারে ; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি' দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর

অনন্ত কল্লোলগীতে ; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে
দিক্ দিগন্তরে ; শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জ্জনে,
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে ইচ্ছা গোপন মনে
উৎসসম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে—হৃদয়ের চারিধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি' বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়—ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি' দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব' কেমনে
অন্তর ভেদিয়া। বসি' শুধু গৃহকোণে
লুব্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কা'রা করেছে ভ্রমণ
কৌতুহলবশে ; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে !—

সুদুর্গম দূরদেশ,—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে ;

দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যাপরে
জরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে প'ড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দ্দয়।

কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি' বাতায়নে
দূরদূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে ;—চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিক-নির্ম্মল স্বচ্ছ ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
প'ড়ে আছে শিকড় আঁকড়ি ; হিম রেখা
নীল গিরিশ্রেণীপরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টিরোধ করি' ; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি' ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জ্জটির তপোবন-দ্বারে।

মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব্ব আভরণহীন ;
যেথা দীর্ঘ রাত্রি-শেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন ! রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্র জননীর মতো।

নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে ; সমুদ্রের তটে
ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্ব্বতসঙ্কটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুখাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি' আসে, কোনোমতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া ; ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন উর্ম্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি, হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে ; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে ক'রে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবস নিশীথে ; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়-সমুদ্র হ'তে অস্ত-সিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনার তুঙ্গগিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি ;
কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোকসনে
দেশ দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি' পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান

দুর্দ্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসীক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম্ম-অনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্ব্বরতা—
নাহি কোনো ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি কোনো প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ,—নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘরপর,
উন্মুক্ত জীবন-স্রোত বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি', সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপজর্জ্জরপরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্ত্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য ক'রে চ'লে যায় আবেশে উল্লাসি,—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সে-ও ভালবাসি—
কতবার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘু তরী সম।
হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর

বহিতেছে অবহেলে ;—দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন—রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি' অতর্কিত শিকারের পরে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা—
হিংসাতীব্র সে আনন্দ সে দৃপ্ত গরিমা
ইচ্ছা করে একবার লভি তা'র স্বাদ ;—
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে ; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলাপরা তব কটিদেশ ;
প্রভাত রৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হ'য়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গপরে সারাদিন দুলি
আনন্দদোলায়। রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দ চরণে, বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে

তোমার সমস্ত পশু পক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে
নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চলপ্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে।
আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি'; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু; তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর; তোমার অন্তরে
কি জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ; কুসুম মুকুল
কি অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে; নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কি গূঢ় পুলকে

কি মূঢ় প্রমোদ-রসে উঠে হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন।
তাই আজি কোনো দিন,—শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্রপরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হ'তে, মিশ্রিত মর্ম্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহ
মোরে আরবার; দূর কর' সে বিরহ—
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে—মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হ'তে উঠে ধূম-লেখা
সন্ধ্যাকাশে; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে

নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে;
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্ব্বাসিত; বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে,—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি'
বিষাদ-ব্যাকুল! আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে, যেথা হ'তে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে,—গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষসুরে, উচ্ছসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু;—
দাঁড়ায়ে রয়েছো তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরাণী যত, আনন্দের রস
কতরূপে হ'তেছে বর্ষণ, দিক দশ
ধ্বনিছে কল্লোল-গীতে। নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্ত্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে। আমার আনন্দ ল'য়ে
হবে নাকি শ্যামতর অরণ্য তোমার,
প্রভাত আলোক মাঝে হবে না সঞ্চার

নবীন কিরণকম্প ? মোর মুগ্ধভাবে
আকাশ ধরণীতল আঁকা হ'য়ে যাবে
হৃদয়ের রঙে, যা দেখে কবির মনে
জাগিবে কবিতা,—প্রেমিকের দু'নয়নে
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে
সহসা আসিবে গান। সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্ব্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে! জীবস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি' আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, তা'রি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরণে ; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান
নদীকূল হ'তে ? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্ত্যবাসী
নিদ্রা হ'তে উঠি' ? আজ শতবর্ষপরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে

কিছু কি র'ব না আমি ? আসিব না নেমে
তা'দের মুখের পরে হাসির মতন,
তা'দের সর্ব্বাঙ্গ মাঝে সরস যৌবন,
তা'দের বসন্ত দিনে অকস্মাৎ সুখ,
তা'দের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুররূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন
ছাড়ি' লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?
চতুর্দ্দিক হ'তে মোরে লবে না কি টানি'
এই সব তরু লতা গিরি নদী বন,
এই চির দিবসের সুনীল গগন,
এ জীবন-পরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি', করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়মাঝে ; কীট পশু পাখী
তরু গুল্ম লতারূপে বারম্বার ডাকি'
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে ;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান
তা'র পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান

বাহিরিব জগতের মহাদেশমাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে।—এখনো মিটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি', তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ!
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী, লহগো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধ'রে
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপনপুরে
আমারে লইয়া যাও—রাখিয়ো না দূরে।

(২৬ কার্ত্তিক, ১৩০০) —সোনার তরী।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল-সিন্ধু উঠিছে আকুলি'
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন-কোণে।
কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে ?

বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,

ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছল-ছল আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে।

হূহু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন ;
তা'রি পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তা'রি পরে পড়ে সন্ধ্যা-কিরণ,
তা'রি মাঝে বসি' এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন ?
আমি তো বুঝি না কি লাগি' তোমার
বিলাস হেন।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
"কে যাবে সাথে?"
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে;
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়,
সোনার ফলে?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না ব'লে।

তা'র পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি।
বেলা ব'হে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চ'লে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়,
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,

আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমির-তলে ?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না ব'লে।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি'।"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব' না
নীরব হাসি।

(২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০০) —সোনার তরী।

প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে ক'রেছো সম্রাট্। তুমি মোরে
পরায়েছো গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছো কণ্ঠ মোর ; তব রাজটীকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তা'রি মাঝে বসায়েছো ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি' সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি' ; অমরবীণায়
উঠিয়াছে কি ঝঙ্কার। নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হ'তে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।—

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ মর্ম্মরে ; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি'
কর-পদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশি
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে ; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে ল'য়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দিরতলে বসি' একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত ; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী ; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্ব্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে ; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায় ; বাঁশরীর ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথীরে ;—হাত ধ'রে মোরে তুমি
ল'য়ে গেছো সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান

অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্‌
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তা'রা নব নব গান
নব অর্থভরা ; চির-সুহৃদ্‌সমান
সর্ব্ব চরাচর। হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন,—সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার,—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছো তুলিয়া, নাহি জানি
কি কারণে! অয়ি মহীয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান! আজি
এই যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধাপানে
অঙ্গ মোর হ'য়েছে অমর? তাহারা কি
পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি'
মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে?
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব্ব দেহ মন

পূর্ণ করি' ; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি' ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে, কমলার
চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্ম্মল গগনের অনন্ত ললাট।
হে মহিমাময়ী মোরে ক'রেছো সম্রাট।

(১৪ মাঘ, ১৩০০) —চিত্রা।

অসম্পূর্ণ সংবাদ

চকোরী ফুকরি কাঁদে—ওগো পূর্ণ চাঁদ,
পণ্ডিতের কথা শুনি' গণি পরমাদ।
তুমি না কি এক দিন র'বে না ত্রিদিবে,
মহাপ্রলয়ের কালে যাবে না কি নিবে?
হায় হায় সুধাকর, হায় নিশাপতি,
তা' হইলে আমাদের কি হইবে গতি?
চাঁদ কহে, পণ্ডিতের ঘরে যাও প্রিয়া,
তোমার কতটা আয়ু এস শুধাইয়া।

—কণিকা।

সন্ধ্যা

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন,
নত করো শির। দিবা হ'লো সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা এ বিশ্বমন্দিরে
এলো আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আন'
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পূরবীর ম্লান-
মন্দ স্বরে। রাখো রাখো অভিযোগ তব,—
মৌন করো বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ। হের, মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র। নির্ব্বাক নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী,—নয়নপল্লব
নত হ'য়ে ঢাকে তা'র নয়ন যুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি করো অনন্তের সনে

সন্ধ্যার আলোকে। বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি। অন্তরের যত কথা
শান্ত হ'য়ে গিয়ে—মর্ম্মান্তিক নীরবতা
করুক্ বিস্তার।

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না ; শূন্য মাঠ জনহীন ;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হ'লো সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি' বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি', ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়!

অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি'
দিগন্তের পানে ; ধীরে যেতেছে প্রবাহি'
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে ; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হ'তেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মতো। ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে

কত যুগযুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তা'র পরে প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তা'র পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে ল'য়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তা'র শেষ।

ক্রমে ঘনতর হ'য়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব-পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হ'তে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—"আরো কোথা?" "আরো কত দূর?"

(৯ ফাল্গুন, ১৩০০) —চিত্রা।

প্রভেদ

অনুগ্রহ দুঃখ করে—দিই, নাহি পাই।
করুণা কহেন, আমি দিই নাহি চাই।

(* ১৩০৬) —কণিকা।

এবার ফিরাও মোরে

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষন্ন তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি'
জাগাতে জগৎ-জনে ? কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল ? কোন্ অন্ধ কারামাঝে জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায় ? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি' করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি' চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তা'র,—
তা'র পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি',
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,

নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
"মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার—তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তা'রে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।"-

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

এবার ফিরাও মোরে, ল'য়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়,

বিজন-বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে। দিন যায়, সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হ'তে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে। কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে নাম তব,আমারে কোরো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রি দিন্ন ; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর ; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল।—যে দিন জগতে চ'লে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি ?
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হ'য়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চ'লে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয় আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তা'র ভাষা,
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি',—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

কি গাহিবে,কি শুনাবে ?—বল মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ

বৃহৎ জগৎ হ'তে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি'—তা'রি মাঝে যাব অভিসারে
তা'র কাছে—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তা'রে।
শুধু এইটুকু জানি—তা'রি লাগি' রাত্রি-অন্ধকারে
চ'লেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন ল'য়েছে সে বক্ষ পাতি'; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তা'রে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তা'রে ক'রেছে কুঠারে,
সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তা'র অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তা'রি লাগি' জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন ;—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তা'রে
মরণে কৃতার্থ করি' প্রাণ। শুনিয়াছি, তা'রি লাগি'
রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণ কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তা'রে অবিশ্বাস

মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্যপ্রতিমা। তা'রি পদে মানী স'পিয়াছে মান,
ধনী স'পিয়াছে ধন, বীর স'পিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।—শুধু জানি তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তা'রি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি'
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি'
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি' বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি'
সুখী করি' সর্ব্বজনে। তা'র পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রাঅবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি

সর্ব্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি' দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্‌ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্তক্ষমা। হয় তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা।

(২৩ ফাল্গুন, ১৩০০) —চিত্রা

খেলেনা

ভাবে শিশু, বড়' হ'লে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি' সমস্ত খেলেনা।
বড়' হ'লে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজনপানে।
আরো বড়' হবে না কি? যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে।

(* ১৩০৬) —কণিকা

মৃত্যুর পরে

আজিকে হ'য়েছে শান্তি, জীবনের ভুল ভ্রান্তি,
সব গেছে চুকে।
রাত্রি দিন ধুক্‌ধুক্‌ তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালোমন্দ, যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।
বল' শান্তি, বল' শান্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি
হ'য়ে যাক্‌ ছাই।

গুঞ্জরি করুণ তান ধীরে ধীরে কর' গান
বসিয়া শিয়রে।
যদি কোথা থাকে লেশ জীবন-স্বপ্নের শেষ
তাও যাক্‌ ম'রে।
তুলিয়া অঞ্চলখানি মুখ-পরে দাও টানি,
ঢেকে দাও দেহ।
করুণ মরণ যথা ঢাকিয়াছে সব ব্যথা,
সকল সন্দেহ

বিশ্বের আলোক যত দিগ্বিদিকে অবিরত
যাইতেছে ব'য়ে,
শুধু ওই আঁখিপরে নামে তাহা স্নেহভরে
অন্ধকার হ'য়ে।
জগতের তন্ত্রীরাজি দিনে উচ্চে উঠে বাজি
রাত্রে চুপে চুপে,
সে শব্দ তাহার পরে চুম্বনের মত' পড়ে
নীরবতারূপে।

মিছে আনিয়াছ আজি বসন্ত কুসুমরাজি
দিতে উপহার ;
নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছ বৃথা শোকে
নয়নাশ্রুধার ;
ছিলে যারা রোষভরে বৃথা এতদিন পরে
করিছ মার্জ্জনা।
অসীম নিস্তব্ধ দেশে চিররাত্রি পেয়েছে সে
অনন্ত সান্ত্বনা।

গিয়েছে কি আছে ব'সে জাগিল কি ঘুমা'ল সে
কে দিবে উত্তর ?
পৃথিবীর শ্রান্তি তা'রে ত্যজিল কি একেবারে,
জীবনের জ্বর ?
এখনি কি দুঃখে সুখে কর্ম্মপথ-অভিমুখে
চলেছে আবার ?
অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা প'লে
পায় কি নিস্তার ?

বসিয়া আপন দ্বারে ভালোমন্দ বল তারে
যাহা ইচ্ছা তাই।
অনন্ত জনম মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে,
সে আর সে নাই।
আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুঃখে সুখে
আসিবে না ফিরে,
তবে তার কথা থাক্, যে গেছে সে চ'লে যাক্
বিস্মৃতির তীরে।

জানি না কিসের তরে যে যাহার কাজ করে
সংসারে আসিয়া,
ভালো মন্দ শেষ করি' যায় জীর্ণ জন্মতরী
কোথায় ভাসিয়া।
দিয়ে যায় যত যাহা রাখ' তাহা ফেল' তাহা
যা ইচ্ছা তোমার।
সে তো নহে বেচাকেনা, ফিরিবে না ফেরাবে না
জন্ম-উপহার।

কেন এই আনাগোনা, কেন মিছে দেখাশোনা
দু'দিনের তরে;
কেন বুকভরা আশা, কেন এত ভালোবাসা
অন্তরে অন্তরে,
আয়ু যার এতটুক্ এত দুঃখ এত সুখ
কেন তার মাঝে;
অকস্মাৎ এ সংসারে কে বাঁধিয়া দিল তারে
শত লক্ষ কাজে?

হেথায় সে অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃত,
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত ?
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি' ?

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল,
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল ?—
চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে সে হয় তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।

সে হয় তো দেখিয়াছে প'ড়ে যাহা ছিল পাছে
আজি তাহা আগে;
ছোট যাহা চিরদিন ছিল অন্ধকারে লীন,
বড় হ'য়ে জাগে;
যেথায় ঘৃণার সাথে মানুষ আপন হাতে
লেপিয়াছে কালী,
নূতন নিয়মে সেথা জ্যোতির্ম্ময় উজ্জ্বলতা
কে দিয়াছে জ্বালি' ?

কত শিক্ষা পৃথিবীর খ'সে পড়ে জীর্ণচীর,
জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয় নিমেষেতে দগ্ধ হয়
চিতা-হুতাশনে ;
সকল অভ্যাস-ছাড়া সর্ব্ব আবরণহারা
সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম'।

আপন মনের মত সঙ্কীর্ণ বিচার যত
রেখে দাও আজ।
ভুলে যাও কিছুক্ষণ প্রত্যহের আয়োজন,
সংসারের কাজ।
আজি ক্ষণেকের তরে বসি' বাতায়নপরে
বাহিরেতে চাহ'।
অসীম আকাশ হ'তে বহিয়া আসুক্ স্রোতে
বৃহৎ প্রবাহ।

উঠিছে ঝিল্লীর গান, তরুর মর্ম্মর তান,
নদীকলস্বর,
প্রহরের আনাগোনা, যেন রাত্রে যায় শোনা
আকাশের পর।
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্তস্বরে
সঙ্গীত উদার
সে নিত্যগানের সনে মিশাইয়া লহ মনে
জীবন তাহার।

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ' তারে সর্ব্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখ' তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তারে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।

আজ বাদে কাল যারে ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন,
তারে ল'য়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন,
এত আলাপন ?
যে বিশ্ব কোলের পরে চির দিবসের তরে
তুলে নিল তারে
তার মুখে শব্দ নাহি, প্রশান্ত সে আছে চাহি'
ঢাকি' আপনারে।

বৃথা তারে প্রশ্ন করি, বৃথা তার পায়ে ধরি,
বৃথা মরি কেঁদে ;—
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে— কোন্ অঞ্চলের তলে
নিয়েছে সে বেঁধে ;
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে ফিরে নিতে চাহি মিছে ;—
সে কি আমাদের ?
পলেক বিচ্ছেদে হায় তখনি তো বুঝা যায়
সে যে অনন্তের।

চক্ষের আড়ালে তাই কত ভয় সংখ্যা নাই ;
সহস্র ভাবনা।
মুহূর্ত্ত মিলন হ'লে টেনে নিই বুকে কোলে,
অতৃপ্ত কামনা।
পার্শ্বে বসি ধরি মুঠি শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি,
চাহি চারিভিতে,
অনন্তের ধনটিরে আপনার বুক চিরে
চাহি লুকাইতে।

হায় রে নির্ব্বোধ নর, কোথা তোর আছে ঘর,
কোথা তোর স্থান।
শুধু তোর ওইটুক অতিশয় ক্ষুদ্র বুক
ভয়ে কম্পমান।
ঊর্দ্ধে ওই দেখ্ চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে
অনন্তের দেশ,
সে যখন একধারে লুকায়ে রাখিবে তারে
পাবি কি উদ্দেশ ?

ওই হের' সীমাহারা গগনেতে গ্রহতারা
অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত হয় তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন পরে
কভু কোনখানে
আর কি গো দেখা হ'বে আর কি সে কথা কবে
কেহ নাহি জানে।

যা হবার তাই হোক্, ঘুচে যাক্ সর্ব্বশোক,
সর্ব্ব মরীচিকা।
নিবে যাক্ চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্ত্ত্য জন্ম-শিখা।
সব তর্ক হোক্ শেষ, সব রাগ সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বল' শান্তি বল' শান্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই।

(১৩০১।) —চিত্রা।

চির-নবীনতা

দিনান্তের মুখ চুম্বি' রাত্রি ধীরে কয়,—
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়;
নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন
আমি তোরে ক'রে দিই প্রত্যহ নবীন।

(* ১৩০৬) —কণিকা।

অন্তর্যামী

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।
বলিতেছিলাম বসি' একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত ;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়ামূরতি কি কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,

আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্তে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,—
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ' গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?

গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষীগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গোরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,

একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে—

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।

কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চ'লেছি পাগল বেশে।

কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘনপঙ্কিল,
কভু সঙ্কট-ছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম,—

খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ,
ধূলায় রৌদ্রে মলিন বরণ,
আশে পাশে হ'তে তাকায় মরণ,
সহসা লাগায় ভ্রম।

তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে।
কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে।
ক্ষ্যাপার মতন কেন এ জীবন?
অর্থ কি তার, কোথা এ ভ্রমণ?
চুপ ক'রে থাকি শুধায় যখন
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে,
আমি যে তোমারে খুঁজি।

রাখ' কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি।
আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার?
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীত-ঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্মমাঝে।
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,

কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে ?

মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর।

হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর ?

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহা মন্দিরতলে ?

নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশিদিনমান,
যেন সচেতন বহ্নিসমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে ?

অর্দ্ধনিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে,
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে ?

কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,

কেন রাখিলে না সবার জগতে
জনতার মাঝখানে ?
জীবন-পোড়ানো এ হোম-অনল
সে দিন কি হবে সহসা সফল ?
সেই শিখা হতে রূপ নির্ম্মল
বাহিরি আসিবে বুঝি ।
সব জটিলতা হইবে সরল
তোমারে পাইব খুঁজি ।

ছাড়ি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
জীবনের শেষে কি নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি ?
চির দিবসের মর্ম্মের ব্যথা,
শত জনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ-নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি ?
ললাট আমার চুম্বন করি
নব চেতনায় দিবে প্রাণ ভরি,
নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি
জানি না চিনিব কি না ।

শূন্য গগন নীল নির্ম্মল,
নাহি রবিশশী গ্রহমণ্ডল,
না বহে পবন, নাই কোলাহল,
বাজিছে নীরব বীণা।

অচল আলোকে রয়েছ' দাঁড়ায়ে,
কিরণ-বসন অঙ্গ জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধভঙ্গে।

গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।

হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি
অঙ্গে অঙ্গে অমৃত-বৃষ্টি
বরষি করুণাভরে।

নিবিড় গভীর প্রেম আনন্দ
বাহুবন্ধনে করেছে বন্ধ,
মুগ্ধ নয়ন হয়েছে অন্ধ
অশ্রু বাষ্প থরে।

নাহিক অর্থ, নাহিক তত্ত্ব,
নাহিক মিথ্যা, নাহিক সত্য,
আপনার মাঝে আপনি মত্ত,—
দেখিয়া হাসিবে বুঝি?

আমি হ'তে তুমি বাহিরে আসিবে,
ফিরিতে হবে না খুঁজি' ॥

যদি কৌতুক রাখ' চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী
তবে তাই হোক্, দেবী, অহরহ
জনমে জনমে রহ, তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দ্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
কখনো হৃদয়ে, কখনো বাহিরে.
কখনো আলোকে, কখনো তিমিরে,
কভু বা স্বপনে, কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।
বক্ষ বীণায় বেদনার তার
এইমতো পুনঃ বাঁধিব আবার,
পরশমাত্রে গীত-ঝঙ্কার
উঠিবে নূতন ভাবে।
এমনি টুটিয়া মর্ম্ম-পাথর
ছুটিবে আবার অশ্রু-নিঝর,

জানি না খুঁজিয়া কী মহাসাগর
বহিয়া চলিবে দূরে।
বরষ বরষ দিবস রজনী
অশ্রু-নদীর আকুল সে ধ্বনি
রহিয়া রহিয়া মিশিবে এমনি
আমার গানের সুরে।
যত শত ভুল করেছি এবার
সেই মতো ভুল ঘটিবে আবার,
ওগো মায়াবিনী, কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে।
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হ'তে পথে, ঘর হ'তে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।
এবারের মতো পূরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান ;
সে সুরা তরল অগ্নিসমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি' ॥

(ভাদ্র ১৩০১) —চিত্রা।

———

সাধনা

দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি' ;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধনখানি ।
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস নিশি ।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার,
ভালোয় মন্দ, আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি ।
তবু ওগো দেবী, নিশিদিন করি' পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি'
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি ।

ওগো ব্যর্থ সাধনখানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।
তুমি যদি দেবী, পলকে কেবল
করো কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল' আঁখিজল
করুণা মানি'
সব হ'তে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি॥

দেবী, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি'।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি' সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা

আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।
ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি,'
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সঙ্গীত গুলি,
হৃদয়াসীনা।
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা॥

দেবী, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি' অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল ;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভালো লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যতদিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্
ধূলার মাঝে।
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার-মাঝ
বিবিধ সাজে।

যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি'—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা-রাশি।
ওগো বিফল বাসনা-রাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবী, লহ কর পাতি,'
আপনার হাতে রাখ' মালা গাঁথি,'
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি,'
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনা-রাশি॥

(৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩০১) —চিত্রা।

ব্রাহ্মণ

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি' আহরণ
বনান্তর হ'তে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি'
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি' লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি' কুটীর-প্রাঙ্গনে
হোমাগ্নি-আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশক্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হ'য়ে,—মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—"বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
করো অবধান।"
হেন কালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি' পশিলা প্রাঙ্গনতলে
তরুণ বালক ; বন্দি' ফলফুলদলে

ঋষির চরণ-পদ্ম, নমি' ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,—
"ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর।"
শুনি' স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে—
"কুশল হউক সৌম্য, গোত্র কী তোমার?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।" —
বালক কহিলা ধীরে,—
"ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য করো অনুমতি।"—
এত কহি' ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি' সত্যকাম, ঘন অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া,—পদব্রজে হ'য়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ।
ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা;
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি' জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি'; হেরি' তারে বক্ষে টানি'
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম—
"কহ গো জননী, মোর পিতার কী নাম,

কী বংশে জনম ? গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে,—গুরু কহিলেন মোরে,—
'বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।'—মাতঃ, কী গোত্র আমার ?"

শুনি' কথা মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী,—"যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবলার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত।"

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক,
শিশির-সুগন্ধি যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,—
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্ত জটা,—
শুচিশোভা সৌমমূর্ত্তি সমুজ্জ্বলকায়
বসেছে বেষ্টন করি' বৃদ্ধ বটচ্ছায়
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গ-কাকলীগান,
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জল-কলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি।

হেনকালে সত্যকাম
কাছে আসি' ঋষিপদে করিলা প্রণাম,—

মেলিয়া উদার অাঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য্য আশীষ করি' শুধাইল তবে,—
"কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয়-দরশন,"—
তুলি' শির কহিল বালক,—"ভগবন্,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে,—কহিলেন তিনি,—'সত্যকাম,
বহু-পরিচর্য্যা করি' পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।' "

শুনি' সে বারতা

ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো—সবে বিস্ময়-বিকল
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্য্যের হেরি' অহঙ্কার।
উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি',—বালকেরে করি' আলিঙ্গন
কহিলেন, "অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।"

(৭ ফাল্গুন, ১৩০১) —চিত্রা ৮

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহরা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর।
যা কিছু হারায়, গিন্নী বলেন, "কেষ্টা বেটাই চোর॥"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন তবু না চেতন মানে॥
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি', "কেষ্টা,"—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা॥
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে,
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে॥
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা"
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে দেখে জ্ব'লে যায় পিত্ত।
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার—বড় পুরাতন ভৃত্য॥

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি, বলে, "আর পারি নাকো,
রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার কেষ্টারে ল'য়ে থাকো॥
না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেলো, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো॥
গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার,—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর?"

শুনে মহারেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধ'রে,—
বলি তা'রে“পাজি, বেরো তুই আজ্ই, দূর ক'রে দিনু তোরে ॥”
ধীরে চ'লে যায়, ভাবি গেল দায় ;—পরদিন উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি ॥
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত,
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে, মোর পুরাতন ভৃত্য ॥

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালাল-গিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি ॥
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়,—বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ;—নহিলে খরচ বাড়ে ॥
ল'য়ে রশারশি করি' কশাকশি পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি',—
“পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।”
আমি কহিলাম, “আরে রাম রাম, নিবারণ সাথে যাবে ॥”
রেলগাড়ী ধায় ;—হেরিলাম হায় নামিয়া বর্দ্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে ॥
স্পর্দ্ধা তাহার হেন মতে আর কত বা সহিব নিত্য।
যত তারে দুষি তবু হ'নু খুসি হেরি' পুরাতন ভৃত্য ॥

নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত ॥
জন ছয় সাথে মিলি' একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হ'লো আশা আরামে দিবস যাবে ॥
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি।
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি ॥

বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ ॥
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—"কেষ্টা আয় রে কাছে,
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে ॥"
হেরি' তার মুখ ভ'রে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধ'রে দাড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য ॥

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত ॥
বলে বার বার, "কর্ত্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে দেখিতে পাইবে পুন ॥"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম ; তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কাল ব্যাধিভার আপনার দেহ-পরে ॥
হ'য়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন : বন্ধ হইল নাড়ী।
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি' ॥
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য ॥

(১২ ফাল্গুন, ১৩৩১) —চিত্রা।

দুই বিঘা জমি

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন "বুঝেছো উপেন, এ জমি লইব কিনে॥"
কহিলাম আমি "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই ;
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়-জোর মরিবার মতো ঠাঁই॥"
শুনি' রাজা কহে,"বাপু, জান তো হে,করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে।"—কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন্ রক্ষে গরীবের ভিটেখানি॥
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া ?"
আঁখি করি' লাল রাজা ক্ষণকাল রহিলা মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে,"আচ্ছা সে দেখা যাবে॥

পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রী, সকল বিক্রী মিথ্যা দেনার খতে॥
এ জগতে, হায়, সেই বেশী চায় ; আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি॥
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান্ রাখিবে না মোহগর্ত্তে,
তাই লিখি' দিল বিশ্ব-নিখিল দু'বিঘার পরিবর্ত্তে॥

সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোহর দৃশ্য ॥
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি ॥
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হ'লো ॥

নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি ॥
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি ॥
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ ;
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ ॥
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌, চোখে আসে জল ভ'রে ॥
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি', রথ-তলা করি' বামে ॥
রাখি' হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি' পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ীর কাছে ॥

ধিক্ ধিক্ ওরে শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি,
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি ?
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র-মাতা,
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা ॥

আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছো বিলাস-বেশ,
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ ॥
আমি তোর লাগি' ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি' ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস্ দিন ?
ধনীর আদরে গরব না ধরে, এতই হয়েছো ভিন্ন ।
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন ॥
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি ;
যত হাস' আজ, যত করো সাজ, ছিলে দেবী, হ'লে দাসী ॥

বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি ;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আম গাছ, এ কী ?
বসি' তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা ॥
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি' তাড়াতাড়ি ছুটি' আম কুড়াবার ধুম ॥
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাবো সে জীবন
সহসা বাতাস ফেলি' গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে ;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে ॥
ভাবিলাম মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা ।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা ॥

হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হ'তে এল মালী ।
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালী ॥

কহিলাম তবে, "আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দু'টি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব?"
চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধ'রে কাঁধে তুলি' লাঠিগাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ॥
শুনি' বিবরণ ক্রোধে তিনি ক'ন্ "মারিয়া করিব খুন।"
বাবু যত বলে, পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ॥
আমি কহিলাম, "শুধু দু'টি আম ভিখ্ মাগি মহাশয়।"
বাবু কহে হেসে "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়॥"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে।
তুমি মহারাজ, সাধু হ'লে আজ, আমি আজ চোর বটে॥

(৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২) —চিত্রা

সত্যের সংযম

স্বপ্ন কহে—আমি মুক্ত; নিয়মের পিছে
নাহি চলি।—সত্য কহে—তাই তুমি মিছে।
স্বপ্ন কয়, তুমি বদ্ধ অনন্ত শৃঙ্খলে।
সত্য কয়, তাই মোরে সত্য সবে বলে।

(* ১৩০৬) —কণিকা

চিত্রা

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে
তুমি চঞ্চল-গামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলক-গন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী।
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন-মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোক-সম অসীমা
অয়ি প্রশান্তহাসিনী।
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

(১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০০) —চিত্রা

উর্ব্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী ;
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী,
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি',
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বালো সন্ধ্যাদীপখানি ;
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র-নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চলো সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী,
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিলো পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি' অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা॥

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী ?
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা ল'য়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপ-দীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে ?
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা ॥

যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী,
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা ॥

সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল,

তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে॥

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী,
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছো তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী॥

ওই শুন, দিশে দিশে তোমা লাগি' কাঁদিছে ক্রন্দসী—
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশী,
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,—
অতল অকূল হ'তে সিক্তকেশে উঠিবে আবার?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
বারিবিন্দু-পাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
র'বে তরঙ্গিতে॥

ফিরিবেনা ফিরিবেনা—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে ব'হে আসে!
পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশী,
ঝরে অশ্রু-রাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে॥

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩০২) —চিত্রা।

ভিক্ষা ও উপার্জ্জন

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি' পাই শস্যকণা!
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস্?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি' কন্ বসুমতী—
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে।

* ১৩০৬) —কণিকা।

স্বর্গ হইতে বিদায়

ম্লান হ'য়ে এলো কণ্ঠে মন্দারমালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্ব্বাপিত জ্যোতির্ম্ময় টীকা
মলিন ললাটে ;—পুণ্যবল হ'লো ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হ'তে বিদায়ের দিন,
হে দেব হে দেবীগণ, বর্ষ লক্ষশত
যাপন ক'রেছি হর্ষে দেবতার মতো
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাবো এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে সদা; লক্ষ লক্ষ বর্ষ তা'র
চক্ষের পলক নহে ;—অশ্বত্থ-শাখার
প্রান্ত হ'তে খসি' গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তা'র ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শতশত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মতো
মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হ'তে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যু-স্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হ'তো মর্ত্ত্যের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে ;—নন্দনকানন

মর্ম্মরিয়া উঠিত নিঃশ্বসি', মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেতো করুণ কাহিনী,
কলকণ্ঠে, সন্ধ্যা আসি' দিবা অবসানে
নির্জ্জন প্রান্তর পারে দিগন্তের পানে
চ'লে যেতো উদাসিনী ; নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লীমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য-সঙ্গীত
নক্ষত্রসভায়। মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনক নূপুরে
তালভঙ্গ হ'তো। হেলি' উর্ব্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্যমনে
অকস্মাৎ ঝঙ্কারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্চ্ছনা। দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতিপাশে বসি' একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি' পিপাসার বারি। ধরা হ'তে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি' আসিত বায়ুস্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস—খসি' ঝরি'
পড়িত নন্দনবনে কুসুম মঞ্জরী।

থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ, স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু'দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু'দণ্ডের তরে।

যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপী তাপী, মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

হে অপ্সরী,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেম-বেদনায়
কভু না হউক্ ম্লান—লইনু বিদায়।
তুমি কারে করনা প্রার্থনা—কারো তরে
নাহি শোক। ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থচ্ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি' সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হ'লে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি' একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে

চন্দনচর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে,
সীমন্ত-সীমায় মঙ্গল সিন্দূরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে ; দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্ন-সম—যবে কোনো অর্দ্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি' নির্ম্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি'
গ্রন্থি সরমের ;—মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি' উঠি' গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর—দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্ত্যভূমি, আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায়দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পূরিল—অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনাপ্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি। তব নীলাকাশ, তব আলো,

তব জনপূর্ণ লোকালয়—সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে
শুভ্র হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা,—বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পণের তলে
পড়েছে আসিয়া।

হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হ'তে ঝরি' পড়ি' তব মাতৃস্তন
করেছিলো অভিষিক্ত—আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে; তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দু'খানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চিরপরিচিতসম,—
তার পরদিন হ'তে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি' র'বে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্দ্ধে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি—চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন্ হারাই।

(২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০২) —চিত্রা।

বিজয়িনী

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি' শিহরি'। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন
পল্লবশয়ন-তলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্চ্ছিত বনের কোলে ; কপোত-দম্পতি
বসি' শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত-গৌরব
অনাদৃত,—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে,—আয়ু-পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি' কটিদেশ
মৌন অপমানে ;—নূপুর রয়েছে পড়ি' ;
বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনক দর্পণখানি চাহে শূন্যপানে

কার মুখ স্মরি'। স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দন কুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লানসুন্দর
শ্বেত করবীর মালা,—ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মতো।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গনরাশি। সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী,—কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে—বক্ষে ল'য়ে টানি'
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ,—নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি' স্কন্ধ-পরে, কহিতেছে বারম্বার
স্নেহের প্রলাপবাণী—কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে
বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে

চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল,—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল,—বিফল কাকলী
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি; ছায়ায় অদূরে
সরোবর প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল;—তৃণাঞ্চিত তীরে
জল কলকলস্বরে মধ্যাহ্ন-সমীরে
সারস ঘুমায়েছিলো দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে ল'য়ে টানি'
ধূসর ডানার মাঝে; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি' সত্বর চঞ্চল
ত্যজি' কোন্ দূর নদী-সৈকত বিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিত-নীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ ব'হে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র-কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু-পরে,
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে ;
পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতী মালা কুঞ্চিত কুন্তলে
গৌর কণ্ঠতটে,—সহাস্য কটাক্ষ করি'
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্ম্মল কোমল
বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি' ল'য়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে ; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ ; বসন্ত-পরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ন কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি' গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হ'য়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে

পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে,—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি' তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তার,—সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি' নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে,—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া;—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।
ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব।

সম্মুখেতে আসি'
থমকিয়া দাঁড়ালো সহসা; মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে; পরক্ষণে ভূমি-পরে
জানু পাতি' বসি' নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর-ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

(১লা মাঘ, ১৩০২) —চিত্রা।

জীবন-দেবতা

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি' অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি' বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম ॥

কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর-শয়ন তব,—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব ॥

আপনি বরিয়া ল'য়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম্ম, আমার কর্ম্ম
তোমার বিজন বাসে ?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছো কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে ?
মানস-কুসুম তুলি' অঞ্চলে
গেঁথেছো কি মালা, প'রেছো কি গলে,
আপনার মনে ক'রেছো ভ্রমণ
মম যৌবনবনে ?

কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন ছুটি ?
ক'রেছো কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝ'রে প'ড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি' ॥

যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি ?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি ॥

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা-কিছু আছিল মোর ?
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর ?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরা-বিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর ?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আর বার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

(২৯ মাঘ, ১৩০২) —চিত্রা

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখিপরে
ধীরে পাত্র লয়েছো করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা
সরস বিম্বাধরে,
কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
মধুর আবেশ-ভরে॥

তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি'
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমল-কোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন
মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি',
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখি,
হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
নবীন মিলনসুখে॥

আজি নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বামকরে ল'য়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়-তলে উষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠেছে বাজি'।
এই নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবী-তীরে আজি॥

দেবী, তব সীঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদূররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি' শঙ্খ বলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কী মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি'
প্রভাতে দিতেছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি'
তুমি এসেছো প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রম-ভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে॥

(১লা ফাল্গুন, ১৩০২) —চিত্রা।

১৪০০ শাল

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ—
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি' পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি' বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি' কল্পনায় অবগাহি'
ভেবে দেখো মনে—
এক দিন শত বর্ষ আগে
চঞ্চল পুলক রাশি কোন্ স্বর্গ হ'তে ভাসি'
নিখিলের মর্ম্মে আসি' লাগে,—

নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধন হীন
উন্মত্ত অধীর—
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু-গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,—
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে
তোমাদের শত বর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে,—
কত কথা, পুষ্প প্রায় বিকশি' তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শত বর্ষ আগে।

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে ?
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক্ ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্ম্মরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে॥

(২রা ফাল্গুন, ১৩০২) —চিত্রা।

চৈতালি

উৎসর্গ

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল॥

তুমি এসো নিকুঞ্জ নিবাসে,
এসো মোর সার্থক-সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব্ব-সমর্পণ;
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন॥

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি' ফেল' বৃন্তগুলি,

সুখাবেশে বসি' লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি' তুলি' ;
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক্ পূর্ণ ফলগুলি ॥

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্ম্মর নিঃশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল ॥

(১৩ই চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি

দেবতার বিদায়

দেবতা-মন্দিরমাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি' নিশিদি
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে—"গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া ক'রে দেহ মোরে ঠাঁই।"
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হ'য়ে যা রে।"
সে কহিল "চলিলাম"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে।"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি' দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া-তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

(১৪ই চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি

সভ্যতার প্রতি

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব-সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়া-রাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি,—সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হ'য়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহা তত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব ;—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন।

—চৈতালি

(১৯শে চৈত্র, ১৩০২)

তপোবন

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পূরব পশ্চিম হ'তে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া ল'য়ে।
রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি' লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি' যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি',—স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি' পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি' সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ক কেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি ল'য়ে শান্ত ভালে।

(১৯শে চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি।

প্রাচীন ভারত

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধত-ললাট ;
স্পর্দ্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টঙ্কারে,
বীণার সঙ্গীত আর নূপুর ঝঙ্কারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জ্জে, বিজয়-উল্লাসে,
রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্ম্মকলরোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্ব্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

(১লা শ্রাবণ ১৩০৩) —চৈতালি।

দিদি

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমী মজুর। তাহাদেরি ছোট মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা; কত ঘষা মাজা
ঘটি বাটি থালা ল'য়ে,—আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেকবার; পিত্তল কঙ্কণ
পিতলের থালি পরে বাজে ঠন্ ঠন্;—
বড় ব্যস্ত সারাদিন। তারি ছোট ভাই,
নেড়া মাথা কাদা মাখা গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি' থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থির ধৈর্য্যভরে। ভরা ঘট ল'য়ে মাথে
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি' শিশুকর; জননীর প্রতিনিধি,
কর্ম্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

(২১শে চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি

———

পদ্মা

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি' পশ্চিমের সূর্য্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ।
অবসান সন্ধ্যালোকে আছিলে সেদিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন ;—
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়েছিল তোমাপানে হাসিভরা মুখে।
সেদিনের পর হ'তে, হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।

নানাকর্ম্মে মোর কাছে আসে নানাজন,
নাহি জানে আমাদের পরাণ-বন্ধন,
নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকা-শয়ন পাতা নির্জ্জন এ পারে।

যখন মুখর তব চক্রবাকদল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি' কোলাহল ;
যখন নিস্তব্ধ গ্রামে তব পূর্ব্বতীরে
রুদ্ধ হ'য়ে যায় দ্বার কুটীরে কুটীরে,
তুমি কোন্ গান করো আমি কোন্ গান
দুই তীরে কেহ তা'র পায়নি সন্ধান।
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
কতবার দেখা শুনা তোমায় আমায়।

কতদিন ভাবিয়াছি বসি' তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হ'তে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খর স্রোতে,—
কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙে-পড়া পাড়
পার হ'য়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?
জন্মান্তরে শতবার যে নির্জ্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,—
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখা শুনা তোমায় আমায় ?

(২৫শে চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি।

বঙ্গমাতা

পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধ'রে।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছো বাঙালী ক'রে, মানুষ করো নি।

(২৬শে চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি।

মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হ'তে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না,
সিন্ধু হ'তে মুক্তা আসে খনি হ'তে সোনা,
বসন্তের বন হ'তে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তা'র।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি' করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।

(২৮শে চৈত্র, ১৩০২) —চৈতালি।

কালিদাসের প্রতি

আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী,—কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস,—রাজ-অধিরাজ।
কোনো চিহ্ন নাহি কারো। আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি' উমাপতি ভূমানন্দ-ভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জ্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনা গান,—গীতিসমাপনে
কর্ণ হ'তে বর্হ খুলি' স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়াপরে।

(১১ই শ্রাবণ, ১৩০২) —চৈতালি।

———

কুমারসম্ভব গান

যখন শুনালে কবি, দেবদম্পতীরে
কুমারসম্ভবগান,—চারিদিকে ঘিরে
দাঁড়ালো প্রমথগণ,—শিখরের পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যা-মেঘস্তর,—
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জ্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি' পুচ্ছ অবনত
স্থির হ'য়ে দাঁড়াইল পার্ব্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত-গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ,—কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল,—কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে,—কবি, চাহি' দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্তগানে।

(১৫ই শ্রাবণ, ১৩০২) —চৈতালি

———

পতিতা

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,—
আমি তা'রি এক বারাঙ্গনা।

সেদিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা;
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।
পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে
পূর্ব্ব অচলে উষার মত,
তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা
জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎ শত।
মনে হ'লো মোর নব-জনমের
উদয়শৈল উজল করি'
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি'।

তরুণীরা মিলি’ তরণী বাহিয়া
পঞ্চমস্বরে ধরিল গান,
ঋষির কুমার মোহিত চকিত
মৃগশিশুসম পাতিল কান।
সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে
মুনি-বালকেরে ফেলিয়া ফাঁদে
ভুজে ভুজে বাঁধি’ ঘিরিয়া ফিরিয়া
নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।
নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
নদীজল-তলে বাজিল শিলা,
ভগবান্ ভানু রক্ত-নয়নে
হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা॥

প্রথমে চকিত দেবশিশু সম
চাহিলা কুমার কৌতূহলে,—
কোথা হ’তে যেন অজানা আলোক
পড়িল তাঁহার পথের তলে।
দেখিতে দেখিতে ভক্তি-কিরণ
দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে,—
দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ
হেরিলেন আজি প্রভাতকালে।
বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি’,
বন্দনা-গান রচিলা কুমার
জোড় করি’ কর-কমল দুটি।

করুণ কিশোর-কোকিল কণ্ঠে
সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তি-মগন
পাতায় পাতায় শিহরি' উঠে।
যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর
হয়নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্ম্মলা ঊষা
নির্জ্জন গিরিশিখর পরে।
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা
নীল নির্ব্বাক্ সিন্ধুতলে,
শুনে গ'লে যায় আর্দ্র হৃদয়
শিশির শীতল অশ্রুজলে॥

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
অঞ্চলতল অধরে চাপি'।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক
ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি'।
ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে
করজোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি',
কহিনু,—"হে মোর প্রভু তপোধন,
চরণে আগত অধম দাসী।"
তীরে ল'য়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ
মুছানু আপন পট্টবাসে।
জানু পাতি' বসি' যুগল চরণ
মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে।

তা'র পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু
উর্দ্ধমুখীন ফুলের মতো,—
তাপস কুমার চাহিলা, আমার
মুখপানে করি' বদন নত।

প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি'
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয়-ভেরী।

ধন্য রে আমি ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমারে রমণী করি'।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি'।

জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয়-বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।

কহিলা কুমার চাহি' মোর মুখে—
"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা?
তোমার পরশ অমৃত-সরস,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"

মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি,—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
শুনিনি এমন সত্যবাণী।

দেবতারে মোর কেহ তো চাহেনি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।

সেইখানে এল আমার তাপস,
সেই পথহীন বিজন গেহ,—
স্তব্ধ নীরব গহন গভীর
যেথা কোনোদিন আসেনি কেহ।

সাধকবিহীন একক দেবতা
ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে,—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।

আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে,—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

কহিলা কুমার চাহি' মোর মুখে,
আনন্দময়ী মূরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি'।

শুনি' সে বচন, হেরি' সে নয়ন
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি।
নিমেষে ধৌত-নির্ম্মল-রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।

প্রভাত-অরুণ ভায়ের মতন
সঁপি' দিল কর আমার কেশে,
আপনার করি' নিল পলকেই
মোরে তপোবন-পবন্ এসে।
তোমার পামরী পাপিনীর দল
খলখল করি' হাসিল হাসি,—
আবেশে বিলাসে ছলনার পাশে
চারিদিক হ'তে ঘেরিল আসি'।
বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে,
বেণী খসি' পড়ে কবরী টুটি',
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে
লীলায়িত করি' হস্ত ছুটি॥

হে মোর অমল কিশোর তাপস
কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি?
আমার কাতর অন্তর দিয়ে
ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি।
হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি, দিতাম টানি'
উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত সরমখানি।
ও আহুতি তুমি নিয়ো না নিয়ো না
হে মোর অনল, তপের নিধি,
আমি হ'য়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি।

ধিক্ রমণীরে ধিক্ শতবার,
হতলাজ বিধি তোমারে ধিক্।
রমণীজাতির ধিক্কার গানে
ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক্।
ব্যাকুল সরমে অসহ ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্নলতিকাসমা
কহিনু তাপসে—"পুণ্যচরিত,
পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা,
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো,
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি।"—
হরিণীর মতো ছুটে চ'লে এনু
সরমের শর মর্ম্মে বিঁধি'॥

কাঁদিয়া কহিনু কাতরকণ্ঠে
"আমারে ক্ষমিয়ো পুণ্যরাশি,"—
চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে
পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি'।
ফেলি' দিল ফুল মাথায় আমার
তপোবন-তরু করুণা মানি',
দূর হ'তে কানে বাজিতে লাগিল
বাঁশির মতন মধুর বাণী,—
"আনন্দময়ী মূরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা?
অমৃতসরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"—

দেবতারে তুমি দেখেছো, তোমার
সরল নয়ন করেনি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।
তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া র'বে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার,
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে ॥

(৯ই কার্ত্তিক, ১৩০৪) —কাহিনী।

কর্ত্তব্য গ্রহণ

কে লইবে মোর কার্য্য ?—কহে সন্ধ্যা রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

(* ১৩০৬) —কণিকা।

ভাষা ও ছন্দ

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি' আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দ্দাম দুর্ব্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জ্জটীর প্রায় ; সেই মতো বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব্ব উদ্বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্ত্তিয়া মুখে
নব ছন্দ ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্ত্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত,
তা'রে ল'য়ে কী করিবে, ভাবে মুনি কী তা'র উদ্দেশ,—
তরুণ গরুড়সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তা'রে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়।—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তা'র বক্ষে বেদনা অপার,
তা'র নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি' চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখীদের সচকিয়া জটা-রশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দন-গন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি', উত্তরিলা তপোভূমি-পরে।
নমস্কার করি' কবি, শুধাইলা সঁপিয়া আসন
"কী মহৎ দৈবকার্য্যে, দেব, তব মর্ত্ত্যে আগমন।"
নারদ কহিলা হাসি'—"করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি'
আমারে কহিলা ডাকি', যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এসো,—বোলো তা'রে, "ওগো ভাগ্যবান্,
এ মহা সঙ্গীতধন কাহারে করিবে তুমি দান।
এই ছন্দে গাঁথি' ল'য়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্ত্যলোকে দিবে অমরতা।"

কহিলেন শির নাড়ি' ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,
"দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য অর্থহারা। বহ্নি ঊর্দ্ধে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি'
কী কহিছে স্বর্গ জানে; অরণ্য উঠায়ে লক্ষশাখা
মর্ম্মরিছে মহামন্ত্র; ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জ্জন গান; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হ'তে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি, মিলাইছে এক স্রোতে
সঙ্গীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধু পারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,

ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তা'র হ'য়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তা'র সীমা দেয় ভাবের চরণে ;
ধূলি ছাড়ি' একেবারে ঊর্দ্ধমুখে অনন্তগগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি' দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভার-হীন।
প্রভাতের শুভ্র ভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ
জগতের মর্ম্মদ্বার মুহূর্ত্তেকে করি' উদ্ঘাটন
নির্ব্বারিত করি' দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার ;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্ব-কর্ম্ম-কোলাহল মন্ত্রবলে করি' দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব্ব খেদ সকল প্রয়াস,
জীবলোক মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস ;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্ব্বাণ অনলের কণা
জ্যোতিষ্কের সূচিপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে ; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা ;
দুর্গম পল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হ'তে দূরে
যৌবনের জয়গান ;—সেই মতো প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সঙ্গীত উচ্ছ্বাস,
আত্ম-বিদারণকারী মর্ম্মান্তিক মহান্ নিশ্বাস।

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তা'রে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
সূর্য্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি' ;
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ,
যাবে চলি' মর্ত্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্দ্ধপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেব-পীঠস্থানে।
মহাম্বুধি যেইমতো ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দ্দিকে অন্তহীন নৃত্য গীতে ঘিরে,—
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে
গা'বে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক্ হ'তে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,—
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্য্যাদা করি' দান।
হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে
স্বর্গ হ'তে যাহা এল' স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি' আনে,
তুলিব দেবতা করি' মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।
ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে
কহ' মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ' মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম

ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে, সর্ব্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে—"অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তি-কথা,"
কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে।
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।"
নারদ কহিলা হাসি', "সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
এত বলি' দেববদূত মিলাইল দিব্য-স্বপ্ন-হেন
সুদূর সপ্তর্ষি লোকে। বাল্মিকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

(*১৩০৪) —কাহিনী।

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
  সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
  যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
  দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
  তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
  এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

এ নহে মুখর বন-মর্ম্মরগুঞ্জিত,
  এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে ;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
  ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে ;
কোথারে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
  কোথারে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা।
  তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
  এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্ব্বরী,
  ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে ;
বিশ্ব-জগৎ নিঃশ্বাসবায়ু সম্বরি'
  স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে ;

সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি'
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা ;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

ঊর্দ্ধ আকাশে তারাগুলি মেলি' অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি' তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি'
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া ;
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি' অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ মিনতি-মাখা ;
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহ-বন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ॥

(প্র—বৈশাখ, ১৩০৪) —কল্পনা*

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা ?
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক্ স্বর্ণ-রসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা ॥

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখ-ভাগিনী।

কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ-পাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী ॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি' ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত নয়নে ;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে ॥

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ;
শশী-তারা-হীনা অন্ধতামসী যামিনী ;
কোথা তোরা পুর-কামিনী।
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী ;
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুর-কামিনী ॥

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ-তিমিরে,
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।

কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপশাখে সখী ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা॥

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
তুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা।
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি' আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা॥

(১৩০৪) —কল্পনা

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তা'র লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে ॥

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীরমন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি,—ঊর্দ্ধে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্ম্য-পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সঙ্কীর্ণপথে দুর্গম নির্জ্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তা'রি দুই ধারে
দু'টি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্ত্তি বসি' দম্ভ-ভরে।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এলো ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-পরে।
হেনকালে হাতে দীপ-শিখা
ধীরে ধীরে নামি' এলো মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশ-ধূপবাস
ফেলিল সর্ব্বাঙ্গে মোর উতলা নিঃশ্বাস।
প্রকাশিল অর্দ্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়॥

মোরে হেরি' প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে,—মোর হস্তে হস্ত রাখি'
নীরবে সুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
"হে বন্ধু, আছ তো ভালো?"—মুখে তা'র চাহি'
কথা বলিবারে গেনু—কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি,—নাম দোঁহাকার
দু'জনে ভাবিনু কত,—মনে নাহি আর।
দু'জনে ভাবিনু কত চাহি' দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিঃস্পন্দ নয়ানে।

দু'জনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন কী ছলে

সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি'
আমার দক্ষিণকরে,—কুলায়-প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখীর মতো ; মুখখানি তা'র
নতবৃন্ত পদ্ম সম এ বক্ষে আমার
নামিয়া পড়িল ধীরে ;—ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি' নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি' দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদী-তীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

(১৩০৪) —কল্পনা

মদনভস্মের পূর্ব্বে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি' ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধু-পবনে
পথিক-বধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াতো পথে আঁচল হ'তে আশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ তরুণী,
বকুলবনে পবন হ'তো সুরার মতো সুরভি
পরাণ হ'তো অরুণবরণী॥

সন্ধ্যা হ'লে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হ'লে তোমার তূণ বাছিয়া ফুল-মুকুলে
সায়ক তারা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধ ছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।
হরিণ সাথে হরিণী আসি' চাহিত দীন নয়ানে
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী॥

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি' করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে ল'য়ে কৌতূহলে উলসি'
পরখছলে খেলিত যুবতী।

শ্যামল তৃণশয়ন-তলে ছড়ায়ে মধু-মাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী
নূপুর দু'টি বাজাতো লালসে॥

কানন-পথে কলস ল'য়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনা-কূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরী
রহিত চাহি' আকুল নয়নে।
বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি' হাসিতে,
সরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া॥

তেমনি আজো উদিছে বিধু মাতিছে মধু-যামিনী,
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে।
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি' কামিনী
মলয়ানিল-শিথিল-দুকূলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে
মাঝেতে বহে বিরহ-বাহিনী।
গোপনব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি' সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী॥

এসগো আজি অঙ্গ ধরি' সঙ্গে করি' সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে
এসো গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহ-দুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।

এসো চতুর মধুর হাসি' তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে,
নবীন করো মানবঘর ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে ॥

(১৩০৪) —কণিকা

নিন্দুকের দুরাশা

মালা গাঁথিবার কালে ফুলের বোঁটায়
ছুঁচ নিয়ে মালাকর দু'বেলা ফোটায়।
ছুঁচ বলে, মনোদুঃখে ওরে জুঁই দিদি,
হাজার হাজার ফুল প্রতিদিন বিঁধি,
কত গন্ধ কোমলতা যাই ফুঁড়ে ফুঁড়ে
কিছু তা'র নাহি পাই এত মাথা খুঁড়ে।
বিধি-পায়ে মাগি বর জুড়ি' কর দুটি
ছুঁচ হ'য়ে না ফোটাই, ফুল হ'য়ে ফুটি।—
জুঁই কহে নিঃশ্বসিয়া—আহা হোক্ তাই,
তোমারো পুরুক্ বাঞ্ছা, আমি রক্ষা পাই।

(*১৩০৬) —কণিকা

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছো এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছো তা'রে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তা'র বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি'
অশ্রু তা'র আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক্ কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি' মূরছি' পড়ে অবনী॥

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়-বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি' ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্ম্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা॥

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।

পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণ মন উল্লাসি'
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে,
পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে করেছো এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে ॥

(১৩০৪) —কল্পনা

স্পষ্টভাষী

বসন্ত এসেছে বনে, ফুল ওঠে ফুটি',
দিনরাত্রি গাহে পিক, নাহি তা'র ছুটি।
কাক বলে, অন্য কাজ নাহি পেলে খুঁজি'
বসন্তের চাটুগান সুরু হ'লো বুঝি।
গান বন্ধ করি' পিক উঁকি মারি' কয়—
তুমি কোথা হ'তে এলে কে গো মহাশয়।—
আমি কাক স্পষ্টবাদী—কাক ডাকি' বলে।
পিক কয়, তুমি ধন্য, নমি পদতলে;
স্পষ্টভাষা তব কণ্ঠে থাক্ বারো মাস,
মোর থাক্ মিষ্টভাষা আর সত্যভাষ।

(*১৩০৬) —কণিকা

পিয়াসী

আমি তো চাহিনি কিছু।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নীচু।
তখনো ভোরের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
নিশির শিশির লোর।
নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাতবায়ে ;
তুমি একাকিনী কুটীর-বাহিরে
বসিয়া অশথ-ছায়ে
নবীন-নবনী-নিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ ;
আমি তো কেবল বিধুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ ॥

আমি তো কহি নি কথা
বকুলশাখায় জানি না কী পাখী
কী জানালো ব্যাকুলতা।
আম্র-কাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে ;
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি ক'রে
মৌমাছি উড়ে আসে।

সরোবরপারে খুলিছে দুয়ার
শিব-মন্দিরঘরে,
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন
শান্ত গভীরস্বরে।
ঘট ল'য়ে কোলে বসি' তরুতলে
দোহন করিছ দুগ্ধ ;
শূন্যপাত্র বহিয়া মাত্র
দাঁড়ায়ে ছিলাম লুব্ধ ॥

আমি তো যাইনি কাছে।
উতলা বাতাস অলকে তোমার
কি জানি কী করিয়াছে।
ঘণ্টা তখন বাজিছে দেউলে
আকাশ উঠিছে জাগি' ;
ধরণী চাহিছে উর্দ্ধগগনে
দেবতা-আশিষ মাগি'।
গ্রামপথ হ'তে প্রভাত আলোতে
উড়িছে গোখুরধূলি,—
উছলিত ঘট বেড়ি' কটিতটে
চলিয়াছে বধূগুলি।
তোমার কাঁকন বাজে ঘনঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ ;
পিয়াসী নয়নে ছিনু এক কোণে
পরাণ নীরবে ক্ষুব্ধ ॥

(১৩০৪) —কল্পনা

পসারিণী

ওগো পসারিণী দেখি আয়,
কী রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছো ধরি'
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়।
সম্মুখে দেখো তো চাহি', পথের যে সীমা নাহি,
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিণী, কথা রাখো, দূর পথে যেয়োনাকো,
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে ॥

হেথা দেখো শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল ;
কূলে কূলে ভরা দীঘি, কাকচক্ষু জল।
ঢালু পাড়ি চারি পাশে কচিকচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকণ-কোমল ;
পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
আম্রবন নিবিড় শীতল।
থাক্ তব বিকি-কিনি ওগো শ্রান্ত পসারিণী,
এইখানে বিছাও অঞ্চল ॥

ব্যথিত চরণ দু'টি ধুয়ে নিবে জলে,
বনফুলে মালা গাঁথি' পরি' নিবে গলে।
আম্রমঞ্জরীর গন্ধ বহি' আনি' মৃদুমন্দ
বায়ু তব উড়াবে অলক,
ঘুঘু-ডাকে ঝিল্লী-রবে কী মন্ত্র শ্রবণে ক'রে,
মুদে যাবে চোখের পলক।
পসরা নামায়ে ভূমে যদি ঢুলে পড়ো ঘুমে,
অঙ্গে লাগে সুখালসঘোর;
যদি ভুলে তন্দ্রাভরে ঘোম্‌টা খসিয়া পড়ে,
তাহে কোনো শঙ্কা নাহি তোর॥

যদি সন্ধ্যা হ'য়ে আসে, সূর্য্য যায় পাটে,
পথ নাহি দেখা যায় জনশূন্য মাঠে,
নাই গেলে বহুদূরে, বিদেশের রাজপুরে,
নাই গেলে রতনের হাটে।
কিছু না করিয়ো ডর, কাছে আছে মোর ঘর,
পথ দেখাইয়া যাবো আগে;
শশীহীন অন্ধ রাত, ধরিয়ো আমার হাত,
যদি মনে বড়ো ভয় লাগে।
শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব,
গৃহকোণে দীপ দিব জ্বালি',
দুগ্ধ-দোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে
আপনি জাগায়ে দিব কালি॥

ওগো পসারিণী,
মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে,
দগ্ধপথে উড়ে তপ্ত বালি,
দাঁড়াও, যেয়ো না আর, নামাও পসরাভার,
মোর হাতে দাও তবে ডালি॥

(১৩০৪) —কল্পনা

কীটের বিচার

মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট,
কেটেকুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ-ওপিঠ।
পণ্ডিত খুলিয়া দেখি' হস্ত হানে শিরে,
বলে, ওরে কীট তুই একী করিলি রে?
তোর দন্তে শাণ দেয়, তোর পেট ভরে
হেন খাদ্য কত আছে ধূলির উপরে।
কীট বলে, হয়েছে কী, কেন এত রাগ,
ওর মধ্যে ছিল কিবা, শুধু কালো দাগ!
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার
আগাগোড়া কেটেকুটে করি ছারখার!

(*১৩০৬) —কণিকা

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল-রবে।
অলসচরণে বসি' বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা প'রেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণ-ধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজপথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
সুধালো কাতরে—"সে কোথায় সে কোথায় ?"
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি',—
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি॥"

গোধূলিবেলায় তখনো জ্বলেনি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ ;—
কনক মুকুর হাতে ল'য়ে বাতায়নে—
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে।
হেনকালে এলো সন্ধ্যা-ধূসর পথে
করুণ নয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্ম্মে আকুল অশ্বগুলি,
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।

সুধালো কাতরে—"সে কোথায় সে কোথায় ?"
ক্লান্ত চরণে আমারি দুয়ারে নামি',—
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
"শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ॥"

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা সারি,
দুয়ার সমুখে ঘুমায়ে প'ড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর গেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী প'রেছি কাঁচলখানি,
দুর্ব্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি'
র'য়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি'—
বাতায়নতলে ব'সেছি ধূলায় নামি',—
ত্রিযামা যামিনী একা ব'সে গান গাহি,
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ॥"

(প্র—আশ্বিন, ১৩০৫) —কল্পনা

শরৎ

আজি কী তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে॥

জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিকো তোমার
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রাম-পথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছো ভুবনে॥

তুলি' মেঘভার আকাশ তোমার
করেছো সুনীলবরণী ;
শিশির ছিটায়ে করেছো শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশিদিশি হ'তে তরণী।
আকাশ করেছো সুনীল অমল
স্নিগ্ধশীতল ধরণী ॥

বহিছে প্রথম শিশির-সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,—
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন ;
হাসি-ভরা মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে ॥

আয় আয় আয়, আছে যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া।
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া॥

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী॥

(প্র—অগ্রহায়ণ, ১৩০৪) —কল্পনা

প্রকাশ

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহেনি কথা ;
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা ॥
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে।
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে ॥
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি।
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি' ॥
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে।
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে ॥

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি।
লতা-পাতা-চাঁদ-মেঘের সহিতে এক হ'য়ে ছিল মিশি ॥
ফুলের মতন ছিল সে মৌন, মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপন-মাখা।
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরথে
ভাবনা-সাধনা-বেদনা-বিহীন বিফল ভ্রমণপথে ॥
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি' কোণে জানিত রচিতে ঘনগম্ভীর মায়া ॥

দ্যুলোকে ভূলোকে ভাবে নাই কেহ আছে সে কিসের খোঁজে
হেন সংশয় ছিল না কাহারো, সে যে কোনো কথা বোঝে ?
বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিলনাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে ॥

বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুধিয়া দিত না তবু্ ॥
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি'
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুল-ধূলি ॥

শশী যবে নিতো নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা
এরে দেখি' হেসে ভাবিত এ লোক জানে না চোখের ভাষা ॥
নলিনী যখন খুলিত পরাণ চাহি' তপনের পানে
ভাবিত এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে ॥
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাতো চুমিয়া মেঘে,
ভাবিত, এ ক্ষ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে ॥
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা
আমি জানি আর তরু জানে শুধু্ কলমর্ম্মর-কথা ॥

একদা ফাগুনে সন্ধ্যা-সময়ে সূর্য্য নিতেছে ছুটি,
পূর্ব্ব গগনে পূর্ণিমা-চাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি ;
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভাণে
ছল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছুপানে ॥
কোনো সাহসিকা দুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি'
না চাহে নামিতে না চাহে থামিতে না মানে বিনয়বাণী ॥
কোনো মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে।
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে ॥

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল—নরনারী, শুন সবে,
কতকাল ধ'রে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে ॥
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত—আকাশের চাঁদ চাহি'
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারা রাত নিদ্ নাহি ॥

উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে।
এতকাল ধ'রে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন্ ছলে॥
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে।
বড়ো বড়ো যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার মানে॥

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল সরমে গগন ভরি'।
শুনিয়া চন্দ্র থমকি' রহিল বনের আড়াল ধরি'॥
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা।
দখিন-বাতাসে ব'লে গেল তারে সকলি পড়েছে ধরা॥
শুনে ছিছি ব'লে শাখা নাড়ি' নাড়ি' শিহরি' উঠিল লতা,
ভাবিল, মুখর এখনি না জানি আরো কী রটাবে কথা॥
ভ্রমর কহিল যূথীর সভায়—যে ছিল বোবার মতো
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত॥

শুনিয়া তখনি করতালি দিয়া হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি॥
"হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ" হাসিয়া সবাই কহে—
"যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে॥"
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি'—
"আকাশে পাতালে মরতে আজি তো গোপন কিছুই নাহি॥"
কহিল হাসিয়া মালা হাতে ল'য়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
"ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি' গেল তুমি আমি কোথা আছি॥"

হায় কবি হায়, সে হ'তে প্রকৃতি হ'য়ে গেছে সাবধানী,—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি'॥

যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু ॥
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হ'তে উপবনে ;
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা,—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা ॥

(*১৩০৪) —কল্পনা

উচ্চের প্রয়োজন

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
হাট ভ'রে দিই আমি কত শস্য ফল।
পর্ব্বত দাঁড়ায়ে রন্ কি জানি কী কাজ,
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ।
বিধাতার অবিচার কেন উঁচুনীচু
সে-কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু।
গিরি কহে—সব হ'লে সমভূমিপারা
নামিত কি ঝরণার সুমঙ্গলধারা ॥

(*১৩০৬) —কণিকা

অশেষ

আবার আহ্বান ?
যত কিছু ছিল কাজ, সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান ॥
জাগায়ে মাধবীবন চ'লে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যূষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি' পুষ্পের শিশির টানি'
গেছে মধ্যদিন।
মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হ'লো অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
আবার অহ্বান ?

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল-পর টানি' দিল ঝিল্লীস্বর
ঘন যবনিকা।
ওপারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।
নয়ন-পল্লবপরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে
থেমে যায় গান ;
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতিসম ;
এখনো আহ্বান ?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস্ হ'রে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্ম্মচ্ছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি'
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হ'তে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান ?

দক্ষিণসমুদ্র-পারে, তোমার প্রাসাদদ্বারে,
হে জাগ্রত রাণী,
বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শান্ত স্বরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী ?
সেথায় কি মূক বনে ঘুমায় না পাখীগণে
আঁধার শাখায় ?
তারাগুলি হর্ম্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাখায় ?
লতাবিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান ?
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
এখনো আহ্বান ?

রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
খেয়া তরী যাক্ ব'য়ে গৃহ-ফেরা লোক ল'য়ে
ওপারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে প'ড়ে যাক্ খসি'
কুটীরের বামে।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ,
আবার চলিনু ফিরে বহি' ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান ॥

বলো তবে কী বাজাবো, ফুল দিয়ে কী সাজাবো
তব দ্বারে আজ,
রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ ?
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা,
চেয়োনাকো ঘৃণাভরে, কোরোনাকো অনাদরে
মোরে অপমান,
মনে রেখো, হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান ॥

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি'
পথের দু'ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি' বিদায় পাইনে দেবী,
ডাকো ক্ষণে ক্ষণে ;
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্ব্বে জাগি' রবো সারারাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র নয়ান,
সেই গর্ব্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্য-সম
তোমার আহ্বান ॥

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়,
হবো আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্তকর ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি' দীর্ঘরাত্রি রবো জাগি',
দীপ নিবিবে না।
কর্ম্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে
করি' যাবো দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা ক'রে
তোমার আহ্বান ॥

(প্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) —কল্পনা

বর্ষ শেষ

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চ'লে আসে
বাধাবন্ধ-হারা,
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি' দীর্ঘধারা।
বর্ষ হ'য়ে আসে শেষ, দিন হ'য়ে এলো সমাপন,
চৈত্র অবসান ;
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্ব্বশেষ গান॥

ধূসর-পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্দ্ধমুখে
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরায় নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীর প্রান্তে আসি'।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চ'লে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী॥

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চসুর।
হৃদয় নির্দ্দয়ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক্
প্রবল প্রচুর।
গাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্দ্ধবেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক্ দূরে যাক্ বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিঃশ্বাসে॥

আনন্দে আতঙ্কে মিশি' ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি' উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক্ তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত্ত-আঘাতে
উড়ে হোক্ ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়॥

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি'
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি' লুপ্ত করি' স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে।
কোথা হ'তে আচম্বিতে মুহূর্ত্তেকে দিক্ দিগন্তর
করি' অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহ ক্ষণকাল॥

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,—
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জ্জে আসে,—
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণবেগে
বিদ্ধ করি' হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে ॥

এবার আসোনি তুমি বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি',
এবার আসোনি তুমি মর্ম্মরিত কূজনে গুঞ্জনে,—
ধন্য ধন্য তুমি।
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছো বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়,—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,—
জয় তব জয় ॥

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি' চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি' বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছো প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে ॥

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছো করিয়া বহন
কিছু নাহি জানো।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চ্চি-রেখা ;
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা ॥

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি' অন্তরেতে হউক্ কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াবো উঠি', আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ ॥

চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি',—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জ্জন করি' ॥

শুধু দিন-যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধুমাঙ্কিত কালী,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়॥

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট্ স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্দ্ধে ল'য়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হ'তে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে॥

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন করো পাখা।
যেখানে নিক্ষেপ করো হৃতপত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত-তমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ॥

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন ;
মেঘের অন্তর পথে অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে
চ'লে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লীরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি' দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথ-গগনে॥

(৩০ চৈত্র, ১৩০৫) —কল্পনা

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব,—হাসে অন্তর্যামী।

(* ১৩০৬) —কণিকা

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি' বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ ॥

ছায়ামূর্ত্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হ'তে ছুটে আসে।
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি' উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্ত্তি তব অনুচর ॥

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বসো আসি' রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী,
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী ॥

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নি-শিখা, লেহি' লেহি' বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি' ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার ॥

হে বৈরাগী করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক্ নদী পার হ'য়ে, যাক্ চলি' গ্রাম হ'তে গ্রামে
পূর্ণ করি' মাঠ।
হে বৈরাগী করো শান্তিপাঠ ॥

সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্ব-পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
অশ্বত্থ ছায়াতে
সকরুণ তব মন্ত্রসাথে ॥

সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকার-ক্ষুব্ধ ধূলাসম উড়ুক্ গগনে,
ভ'রে দিক্ নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধসনে
আকুল আকাশ।
সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ ॥

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি' নভস্তলে—বিশাল বৈরাগ্য আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল।
দাও পাতি' গেরুয়া অঞ্চল॥

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ,
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি' উঠি' বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রবো প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্ব্বাক।
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ॥

(১৩০৬) —কল্পনা

অকৃতজ্ঞ

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,—
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

(* ১৩০৬) —কণিকা

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

(অবদানশতক)

"প্রভু বুদ্ধ লাগি' আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী কে রয়েছো জাগি',"—
অনাথ-পিণ্ডদ * কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।

সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর গগন-লগন-
প্রাসাদে॥

বৈতালিকদল সুপ্তিতে শয়ান,
এখনো ধরেনি মাঙ্গলিক গান,
দ্বিধাভরে পিক মৃদু কুহুতান
কুহরে।

ভিক্ষু কহে ডাকি'—"হে নিদ্রিত পুর,
দেহ ভিক্ষা মোরে, করো নিদ্রা দূর"—
সুপ্ত পৌরজন শুনি' সেই সুর
শিহরে॥

---

* অনাথ-পিণ্ডদ বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

সাধু কহে, "শুন, মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সব ধর্ম্মমাঝে ত্যাগধর্ম্ম সার
ভুবনে।"

কৈলাসশিখর হ'তে দূরাগত
ভৈরবের মহা-সঙ্গীতের মতো
সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রা-রত
ভবনে॥

রাজা জাগি' ভাবে বৃথা রাজ্যধন,
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জ্জন
বালিকা।

যে ললিত সুখে হৃদয় অধীর,
মনে হ'লো তাহা গত যামিনীর
স্খলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর
মালিকা॥

বাতায়ন খুলে যায় ঘরে ঘরে,
ঘুম-ভাঙা আঁখি ফুটে থরে থরে
অন্ধকার পথ কৌতূহল ভরে
নেহারি'।

"জাগো ভিক্ষা দাও" সবে ডাকি' ডাকি',
সুপ্ত সৌধে তুলি' নিদ্রাহীন আঁখি,
শূন্য রাজবাটে চলেছে একাকী
ভিখারী ॥

ফেলি' দিল পথে বণিক-ধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি' রতন-কণিকা,
কেহ কণ্ঠহার মাথার মণিকা
কেহ গো।

ধনী স্বর্ণ আনে থালি পূরে পূরে,
সাধু নাহি চাহে, প'ড়ে থাকে দূরে,
ভিক্ষু কহে—"ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহ গো ॥"

বসনে ভূষণে ঢাকি' গেল ধূলি,
কনকে রতনে খেলিল বিজুলী,
সন্ন্যাসী ফুকারে ল'য়ে শূন্য ঝুলি
সঘনে—

"ওগো পৌরজন, করো অবধান,
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ তিনি, বুদ্ধ ভগবান্,
দেহ তাঁরে নিজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান
যতনে ॥"

ফিরে যায় রাজা, ফিরে যায় শেঠ,
মিলে না প্রভুর যোগ্য কোনো ভেট,
বিশাল নগরী লাজে রহে হেঁট-
আননে।

রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ,
মহা-নগরীর পথ হ'লো শেষ,
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে॥

দীন নারী এক ভূতল-শয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি' নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।

অরণ্য-আড়ালে রহি' কোনো মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হ'তে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি' দিল পথে
ভূতলে॥

ভিক্ষু ঊর্দ্ধভুজে করে জয় নাদ,
কহে—"ধন্য মাতঃ, করি আশীর্ব্বাদ,
মহা ভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।"

চলিল সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি ল'য়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর-
আলোকে ॥

(৫ কার্ত্তিক, ১৩০৪) —কথা

ভার

টুন্‌টুনি কহিলেন—রে ময়ূর তোকে
দেখে করুণায় মোর জল আসে চোখে।
ময়ূর কহিল, বটে! কেন, কহ শুনি,
ওগো মহাশয় পক্ষী, ওগো টুন্‌টুনি।
টুন্‌টুনি কহে—এ যে দেখিতে বেয়াড়া,
দেহ তব যত বড়ো পুচ্ছ তারে বাড়া।
আমি দেখো লঘুভারে ফিরি দিনরাত,
তোমার পশ্চাতে পুচ্ছ বিষম উৎপাত।
ময়ূর কহিল, শোক করিয়ো না মিছে,
জেনো ভাই ভার থাকে গৌরবের পিছে ॥

(* ১৩০৬) —কণিকা

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি' গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি'। সঙ্গীদল গেল জুটি'
কত বাল বৃদ্ধ নর নারী, নৌকা দু'টি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

পুণ্যলোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি', "হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হবো সাথী।"—বিধবা যুবতী,
দু'খানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে,—অনুরোধ তা'র
এড়ানো কঠিন বড়ো—"স্থান কোথা আর,"
মৈত্র কহিলেন তা'রে। "পায়ে ধরি তব"
বিধবা কহিল কাঁদি', "স্থান করি' লবো
কোনোমতে একধারে।" ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তা'রে শুধালো ব্রাহ্মণ,
"নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে?"
উত্তর করিল নারী—"রাখাল? সে র'বে
আপন মাসীর কাছে। তা'র জন্ম-পরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে
বাঁচিব ছিল না আশা; অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তা'রে স্তন

মানুষ করেছে যত্নে,—সেই হ'তে ছেলে
মাসীর আদরে আছে মার কোল ফেলে।
দুরন্ত, মানে না কা'রে, করিলে শাসন
মাসী আসি' অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তা'রে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসীমার বুকে।"
সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল—বাঁধি' জিনিষপত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে—সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি' দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি',
রাখাল বসিয়া আছে তরী-পরে উঠি'
নিশ্চিন্ত নীরবে। "তুই হেথা কেন ওরে ?"
মা শুধালো ; সে কহিল, "যাইব সাগরে।"
"যাইবি সাগরে, আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়!"—পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা—"যাইব সাগরে।"
যত তা'র বাহু ধরি' টানাটানি করে,
রহিল সে তরণী আঁকড়ি'। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
"থাক্ থাক্ সঙ্গে যাক্।" মা রাগিয়া বলে
"চল্, তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে!"
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপ-বাণে

বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
"নারায়ণ নারায়ণ" করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি'—তা'র সর্ব্বদেহে
করুণ কল্যাণ হস্ত বুলাইল স্নেহে।
মৈত্র তা'রে ডাকি' ধীরে চুপি চুপি কয়,
"ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।"
রাখাল যাইবে সাথে স্থির হ'লো কথা,—
অন্নদা লোকের মুখে শুনি' সে বারতা
ছুটে আসি' বলে, "বাছা, কোথা যাবি ওরে?"
রাখাল কহিল হাসি', "চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসী।" পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি', "ঠাকুর মশায়
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,—
কে তাহারে সামালিবে? জন্ম হ'তে তা'র
মাসী ছেড়ে বেশী ক্ষণ থাকেনি কোথাও;
কোথা এরে নিয়ে যাবে? ফিরে দিয়ে যাও।"
রাখাল কহিল—"মাসী, যাইব সাগরে
আবার ফিরিব আমি।" বিপ্র স্নেহভরে
কহিলেন—"যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি' কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ,
অনেক যাত্রীর মেলা—পথের বিপদ
কিছু নাই,—যাতায়াতে মাস দুই কাল,—
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।"

শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি' নৌকা দিল ছাড়ি'।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রু-চোখে। হেমন্তের প্রভাত-শিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণী নদীতীরে।

যাত্রীদল ফিরে আসে; সাঙ্গ হ'লো মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ণ বেলা
জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসীর কোলের লাগি'।—জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তা'র হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছলভরা, তুলি' লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জ্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব্ব-উপদ্রব-সহা আনন্দভবন
শ্যামল কোমলা। যেথা যে কেহই থাকে
অদৃশ্য দুবাহু মেলি' টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্ত-বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে।
চঞ্চল বালক আসি' প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুককণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,

"ঠাকুর, কখন্ আজি আসিবে জোয়ার ?"
সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার
তুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ ; মৃতু আর্ত্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান,—কলশব্দ গীতে
সিন্ধুর বিজয় পথ পশিল নদীতে,—
আসিল জোয়ার।—মাঝি দেবতারে স্মরি'
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি' ব্রাহ্মণের কাছে,
"দেশে পঁহুছিতে আর কত দিন আছে ?"

সূর্য্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ তুই ছেড়ে,
উত্তর বায়ুর বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে।
রূপনারায়ণের মুখে পড়ি' বালুচর
সঙ্কীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তরসমীরে
উত্তাল উদ্দাম। "তরণী ভিড়াও তীরে,—"
উচ্চকণ্ঠে বারম্বার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর। চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। এক দিকে যায় দেখা
অতি দূর তটপ্রান্তে নীল বনরেখা ;—
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্য্যাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি'

উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীতপবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক্,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি' উর্দ্ধডাক,
ডাকি' আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি' করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি' কহে সবে—
"বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কেউ,
যা মেনেছে দেয় নাই তাই এত ঢেউ,
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,
করহ মানৎ রক্ষা—করিয়ো না খেলা
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে!" যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা কিছু জলে ফেলি' দিল
না করি' বিচার। তবু তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্ব্বার—"দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে ল'য়ে এই বেলা শোন্।"
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি' কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি'—"এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি' দিয়া আপনার ছেলে
চুরি ক'রে নিয়ে যায়।"—"দাও তারে ফেলে"

একবাক্যে গর্জ্জি' উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, "হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো!" দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি' ধরে।
ভর্ৎসিয়া গর্জ্জিয়া উঠি' কহিলা ব্রাহ্মণ,
"আমি তোর রক্ষাকর্ত্তা; রোষে নিশ্চেতন
মা হ'য়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে;
শোধ্ দেবতার ঋণ; সত্য ভঙ্গ ক'রে,
এতগুলি প্রাণী তুই ডুবাবি সাগরে!"

মোক্ষদা কহিল, "অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে—ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হ'লো? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝোনি ঠাকুর?
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছো দেবতা?
শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা?
বলিতে বলিতে যত মিলি' মাঝি দাঁড়ী
বল করি' রাখালেরে নিলো ছিঁড়ি' কাড়ি'
মা'র বক্ষ হ'তে। মৈত্র মুদি' দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি'
দন্তে দন্ত চাপি' বলে। কে তা'রে সহসা
মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা
দংশিল বৃশ্চিক দংশ।—"মাসী, মাসী, মাসী"
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি'

নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি' উঠিল বিপ্র—"রাখ্‌ রাখ্‌ রাখ্‌।"
চকিতে হেরিল চাহি' মূর্চ্ছি' আছে প'ড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্ত্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ মাঝে মেলি' আর্ত্ত চোখ
মাসী বলি' ফুকারিয়া মিলালো বালক
অনন্ত তিমির তলে ;—শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুলবলে ঊর্দ্ধপানে উঠি'
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে
"ফিরায়ে আনিব তোরে", কহি' ঊর্দ্ধশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্ত-মাঝে ঝাঁপ দিল জলে,
আর উঠিল না। সূর্য্য গেল অস্তাচলে।

(* ১৩০৫) —কথা ও কাহিনী

এক-তরফা হিসাব

সাতাশ, হ'লে না কেন একশো-সাতাশ,
থলিটি ভরিত, হাড়ে লাগিত বাতাস।
সাতাশ কহিল, তাহে টাকা হ'তো মেলা,
কিন্তু কী করিতে বাপু বয়সের বেলা ?

(* ১৩০৬) —কণিকা

অভিসার

(বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা)

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত ;—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ-গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত ॥

কাহার নূপুর-শিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে।
সন্ন্যাসীবর চমকি' জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে ॥

নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবন-মদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ,
রুনুঝুনু-রবে বাজে আভরণ ;
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ
থামিল বাসবদত্তা ॥

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌর-কান্তি।
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি॥

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা :—
ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া করো যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণী-তল কঠিন কঠোর,
এ নহে তোমার শয্যা॥

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয়নি,
যেথায় চলেছো, যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে, আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে॥

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ-শিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়-শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য॥

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথ-তরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা॥

অতি দূর হ'তে আসিছে পবনে
বাঁশীর মদির-মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি' নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র॥

নির্জ্জন পথে জ্যোৎস্না আলোতে
সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরু-বীথিকার
কোকিল কুহরি' উঠে বার-বার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর
আজি অভিসার রাত্রি?

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহির প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি' পরিখার পারে,
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে,
কে ওই রমণী প'ড়ে একধারে
তাঁহার চরণোপান্তে॥

নিদারুণ রোগে মারী-গুটিকায়
ভ'রে গেছে তার অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালী তনু তার
ল'য়ে প্রজাগণে, পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি' পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ॥

সন্ন্যাসী বসি' আড়ষ্ট শির
তুলি' নিলো নিজ অঙ্কে।
ঢালি' দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-পরে,
লেপি' দিল দেহ আপনার করে
শীত চন্দন-পঙ্কে॥

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনা-মত্তা।
"কে এসেছো তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়
এসেছি বাসবদত্তা॥"

(১৯শে আশ্বিন, ১৩০৬) —কথা

———

স্পর্শমণি

(ভক্তমাল)

নদী-তীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম॥
শুধালেন সনাতন, “কোথা হ'তে আগমন,
কী নাম ঠাকুর ?”
বিপ্র কহে, “কী বা কবো, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি' বহুদূর ;
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্দ্ধমানে,
এতবড়ো ভাগ্যহত দীন হীন মোর মতো
নাই কোনোখানে॥
জমিজমা আছে কিছু, ক'রে আছি মাথা নীচু,
অল্প স্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম্ম যজ্ঞ যাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে
আজ কিছু নাই॥
আপন উন্নতি লাগি' শিব কাছে বর মাগি
করি' আরাধনা।—
একদিন নিশি ভোরে স্বপ্নে দেব কন্ মোরে—
“পূরিবে প্রার্থনা ;

যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায়,
তাঁরে পিতা বলি' মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায় ॥"
শুনি' কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন—
"কী আছে আমার ?
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি'—
ভিক্ষামাত্র সার ॥"
সহসা বিস্মৃতি ছুটে,—সাধু ফুকারিয়া উঠে
"ঠিক বটে ঠিক !
একদিন নদী-তটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ মাণিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে ;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে !"
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি', খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি,
লোহার মাদুলি দু'টি সোনা হ'য়ে উঠে ফুটি',
ছুঁইল যেমনি ॥
ব্রাহ্মণ বালুর পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে ॥

নদী-পারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে,—
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রু-জলে,—
"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।"—এত বলি' নদীনীরে
ফেলিল মাণিক॥

(১৯শে আশ্বিন, ১৩০৬) —কথা

কুটুম্বিতা-বিচার

কেরোসিন্‌-শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
ভাই ব'লে ডাক যদি দেবো গলা টিপে।
হেন কালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,—
কেরোসিন্‌ বলি' উঠে—এসো মোর দাদা॥

(* ১৩০৬) —কণিকা

বন্দী বীর

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ্—
নির্ম্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয়
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্।
নূতন জাগিয়া শিখ্
নূতন উষার সূর্য্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ্॥

"অলখ নিরঞ্জন—'
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়-ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন উল্লাসে
অসি বাজে ঝঞ্ঝন্।
পঞ্জাব আজি গরজি' উঠিল—
"অলখ নিরঞ্জন॥"
এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ।

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনা-হীন।
পঞ্চ নদীর ঘিরি' দশ তীর
এসেছে সে একদিন॥

দিল্লী-প্রাসাদ-কূটে
হোথা বার-বার বাদশা-জাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।
কা'দের কণ্ঠে গগন মন্থে,
নিবিড় নিশীথ টুটে,
কা'দের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে॥

পঞ্চ নদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্ত-লহরী
মুক্ত হইল কি রে?
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরালো
পঞ্চ নদীর তীরে॥

মোগল শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি' ধরিল আঁকড়ি'
দুই জনা দুই জনে।

দংশন-ক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
সে দিন কঠিন রণে
"জয় গুরুজীর" হাঁকে শিখ-বীর
সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্ত-পাগল
"দীন্ দীন্" গরজনে॥

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল
তুরাণী সেনার করে
সিংহের মতো শৃঙ্খল-গত
বাঁধি' ল'য়ে গেল ধ'রে
দিল্লী-নগর-পরে।
বন্দা সমরে বন্দী হইল
গুরুদাসপুর গড়ে॥

সম্মুখে চলে মোগল-সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্ষা-ফলকে তুলি'।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে
বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ-পরে লোক নাহি ধরে
বাতায়ন যায় খুলি'।

শিখ গরজয় "গুরুজীর জয়"
পরাণের ভয় ভুলি'।
মোগলে ও শিখে উড়ালো আজিকে
দিল্লী-পথের ধূলি॥

পড়ি' গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান
তা'রি লাগি' তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
"জয় গুরুজীর" কহি' শত বীর
শত শির দেয় ডারি॥

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল' তুলি'
বন্দার এক ছেলে ;
কহিল, "ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।"
দিল তা'র কোলে ফেলে
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তা'র,
বন্দার এক ছেলে॥

কিছু না কহিল বাণী,
বন্দা সুধীরে ছোট ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি'।

ক্ষণকাল-তরে মাথার উপরে
রাখে দক্ষিণ পাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তাঁর
রাঙা উষ্ণীষখানি।
তার পরে ধীরে কটিবাস হ'তে
ছুরিকা খসায়ে আনি'—
বালকের মুখ চাহি'
"গুরুজীর জয়" কানে কানে কয়—
"রে পুত্র, ভয় নাহি॥"

নবীন বদনে অভয় কিরণ
জ্বলি' উঠে উৎসাহি'—
কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল
বালক উঠিল গাহি'—
"গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়—"
বন্দার মুখ চাহি'॥

বন্দা তখন বামবাহুপাশ
জড়াইল তা'র গলে,—
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে
ছুরি বসাইল বলে—
"গুরুজীর জয়" কহিয়া বালক
লুটালো ধরণী-তলে॥

সভা হ'লো নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।

স্থির হ'য়ে বীর মরিল, না করি'
একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হ'লো নিস্তব্ধ॥

(৩০ আশ্বিন, ১৩০৬) —কথা

আত্ম-শত্রুতা

খোঁপা আর এলোচুলে বাধিল বচসা,
জুটিল পাড়ার লোক দেখিতে তামাসা।
খোঁপা কয়, এলোচুল, কী তোমার ছিরি!
এলো কয়, খোঁপা তুমি রাখো বাবুগিরি।
খোঁপা কহে, টাক ধরে হই তবে খুসি।
—তুমি যেন কাটা পড়ো—এলো কয় রুষি'।
কবি মাঝে পড়ি' বলে—মনে ভেবে দেখ্
দু'জনেই এক তোরা, দু'জনেই এক।
খোঁপা গেলে চুল যায়,—চুলে যদি টাক
খোঁপা, তবে কোথা র'বে তব জয়ঢাক॥

(*১৩০৬) —কণিকা।

উদ্বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে॥

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি ব'সে ব'সে গাঁথিস্‌নে আর,
বাঁধিস্‌নে স্মৃতি-বাহিনী।
যা আসে আসুক, যা হবার হোক্‌,
যাহা চ'লে যায় মুছে যাক্‌ শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক্‌ দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী।
নিমেষে নিমেষ হ'য়ে যাক্‌ শেষ
বহি' নিমেষের কাহিনী॥

ফুরায় যা, দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাস্‌নেকো কুড়াতে।

বুঝি নাই যাহা, চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা, চাই না খুঁজিতে,
পূরিল না যাহা, কে রবে যুঝিতে
তা'রি গহ্বর পূরাতে।
যখন যা পাস্ মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস্ ফুরাতে॥

ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি।
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে
আজিকার মতো যাক্ যাক্ চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি॥

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে।
মর্ম্মর তানে ভ'রে ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে॥

(১৩০৬), —ক্ষণিকা

যথাস্থান

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোন্‌খানে তোর স্থান ?
পণ্ডিতেরা থাকেন যেথায়
বিদ্যেরত্ন পাড়ায়—
নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে
কাহার সাধ্য দাঁড়ায়,—
চল্‌ছে সেথায় সূক্ষ্ম তর্ক
সদাই দিবারাত্র—
পাত্রাধার কি তৈল, কিম্বা
তৈলাধার কি পাত্র ;
পুঁথিপত্র মেলাই আছে
মোহধ্বান্ত-নাশন
তা'রি মধ্যে একটি প্রান্তে
পেতে চাস্ কি আসন ?
গান তা' শুনি' গুঞ্জরিয়া
গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে ॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান্ ?

পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ-পরে
আছেন ভাগ্যমন্ত,
মেহাগিনীর মঞ্চ জুড়ি'
পঞ্চহাজার গ্রন্থ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা ;
অস্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা।
ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে
যত্ন পূরা মাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী
সেথায় কর্‌বি যাত্রা ?
গান তা' শুনি' কর্ণমূলে
মর্ম্মরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে ॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি মান ?
নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে
একজামিনের পড়ায়,
মন্‌টা কিন্তু কোথা থেকে
কোন্ দিকে যে গড়ায়।

অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব
সাম্‌নে আছে খোলা,
কর্ত্তৃ-জনের ভয়ে কাব্য
কুলুঙ্গিতে তোলা ;—
সেইখানেতে ছেঁড়া-ছড়া
এলোমেলোর মেলা,
তা'রি মধ্যে ওরে চপল,
ক'র্‌বি কি তুই খেলা ?
গান তা' শুনে মৌন মুখে
রহে দ্বিধার ভরে,—
যাবো-যাবো করে ॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি ত্রাণ ?
ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মীবধূ
যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে, ছুটি পায় সে
যখন মাঝে মাঝে।
বালিশ-তলে বইটি চাপা
টানিয়া লয় তা'রে—
পাতাগুলিন ছেঁড়া-খোঁড়া
শিশুর অত্যাচারে।
কাজল-আঁকা সিঁদুর মাখা
চুলের গন্ধে ভরা

শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে
চাস্ কি যেতে ত্বরা ?
বুকের পরে নিঃশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান ॥

কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্
ওরে আমার গান,
কোথায় পাবি প্রাণ ?
যেথায় সুখে তরুণ যুগল
পাগল হ'য়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে
সবার আঁখি এড়ায় ;
পাখী তাদের শোনায় গীতি,
নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়,
পুষ্প লতা পাতা,
সেইখানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ব-বাঁশীর ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে ?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান ॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা

ভীরুতা

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাস্‌বি কিনা
বুঝ্‌বো কেমন ক'রে ?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই সখী
নিজের কথাটাই।
হাল্‌কা তুমি করো পাছে
হাল্‌কা করি ভাই,
আপন ব্যথাটাই॥

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাস্‌বি কিনা
বুঝ্‌বো কেমন ক'রে ?
মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
উল্টা ক'রে বলি আমি
সহজ কথাটাই।

ব্যর্থ তুমি করো পাছে
ব্যর্থ করি ভাই,
আপন ব্যথাটাই ॥

সোহাগ-ভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে পাবো কিনা
বুঝ্‌বো কেমন ক'রে?
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই;
গর্ব্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।
ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই ॥

ইচ্ছা ক'রে নীরব হ'য়ে,
রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের পরে বুকের কথা
উথ্‌লে ওঠে পাছে।
অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই;
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।

তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি ভাই
আপন ব্যথাটাই ॥

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই
না আসি তোর কাছে ;
সাহস নাহি পাই ।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয় রে পাছে ।
কেবল এসে তাই,
দেখা দিয়েই যাই ;
স্পর্দ্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই ।
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি ভাই,
আপন ব্যথাটাই ॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা

সেকাল

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে,
একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে
উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ী।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা ব'স্‌তো সন্ধ্যা হ'লে,
ক্রীড়া-শৈলে আপন মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি'।
জীবনতরী ব'হে যেতো
মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে॥

২

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি,
থাক্‌তোনাকো ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম, যেন
নাইকো মৃত্যু জরা।

ছ'টা ঋতু পূর্ণ ক'রে
ঘ'ট্‌তো মিলন স্তরে স্তরে,
ছ'টা সর্গে বার্ত্তা তাহার
রৈতো কাব্যে গাঁথা।
বিচ্ছেদও সুদীর্ঘ হ'তো,
অশ্রুজলের নদীর মতো
মন্দগতি চ'ল্‌তো রচি'
দীর্ঘ করুণ গাথা।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাক্‌তোনাকো
একটুমাত্র ত্বরা॥

৩

অশোক-কুঞ্জ উঠ্‌তো ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে;
বকুল হ'তো ফুল্ল, প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।
প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি' করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মতো।
কোনো নামটি মন্দালিকা
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝঙ্কারিত কত।

আস্‌তো তা'রা কুঞ্জবনে
চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক-শাখা উঠ্‌তো ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে ॥

৪

কুরুবকের প'র্‌তো চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রৈতো হাতে
কি জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজ্‌তো কুন্দফুলে,
শিরীষ প'র্‌তো কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিতো
নব-নীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধুঁয়া দিতো কেশে
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু
মাখ্‌তো মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরুগন্ধ
লেগে থাক্‌তো সাজে,
কুরুবকের প'র্‌তো মালা
কালো কেশের মাঝে ॥

৫

কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈতো ঢাকা
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংস-মিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রৈতো বঁধুর আশে,
একটি ক'রে পূজার পুষ্পে
দিন গণিত ব'সে।
বক্ষে তুলি' বীণাখানি
গান গাহিতে ভুল্‌তো বাণী
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
প'ড়্‌তো খ'সে খ'সে।
মিলন-রাতে বাজ্‌তো পায়ে
নূপুর দুটি বাঁকা;
কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈতো ঢাকা॥

৬

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিতো
সাধের সারিকারে,
নাচিয়ে নিতো ময়ূরটিরে
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।

কপোতটিরে ল'য়ে বুকে
সোহাগ ক'র্‌তো মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিতো
পদ্মকোরক বহি'।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কইতো শৌরসেনী,
ব'ল্‌তো সখীর গলা ধ'রে—
"হলা পিয় সহি।"
জল সেচিত আলবালে
তরুণ সহকারে।
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিতো
সাধের সারিকারে॥

৭

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্
মালবিকার জালে।
কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে
বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে

কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে।
ছল ক'রে তা'র বাধ্‌তো আঁচল
সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে॥

৮

হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
ল'য়ে তারিখ শাল।
হারিয়ে গেছে সে-সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদি, আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল।
হায় রে গেল সঙ্গে তা'রি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল।

কোন্ স্বরগে নিয়ে গেল
বরমাল্যের থাল।
হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল॥

৯

যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন
সে-সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরি দুঃখে আমায়
ক'র্‌চে অন্যমনা।
তবু মনে প্রবোধ আছে—
তেম্‌নি বকুল ফোটে গাছে,
যদিও সে পায় না নারীর
মুখ-মদের ছিটা।
ফাগুন মাসে অশোক ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হ'তে বাতাসটুকু
তেম্‌নি লাগে মিঠা।
অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া
অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিও রে নাইকো কোথাও
সে-সব বরাঙ্গনা॥

১০

এখন যাঁরা বর্ত্তমানে,
আছেন মর্ত্ত্যলোকে,
মন্দ তা'রা লাগ্‌তো না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্ত্তা
অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্চে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেতো
কালিদাসের কালে।
ম'র্‌বো না ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে
তাঁরা সবাই অন্যনামে
আছেন মর্ত্ত্যলোকে॥

১১

আপাতত এই আনন্দে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান্‌নি মহাকবি।
বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।
প্রিয়ে, তোমার তরুণ আঁখি
প্রসাদ যেচে যেচে,
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা

পরিচয়

দয়া বলে, কেগো তুমি, মুখে নাই কথা!
অশ্রুভরা আঁখি বলে—আমি কৃতজ্ঞতা।

(*১৩০৬) —কণিকা

যাত্রী

আছে, আছে স্থান।
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।
না হয় হবে ঘেঁসাঘেঁসি,
এমন কিছু নয় সে বেশী,
না হয় কিছু ভারি হবে
আমার তরীখান,—
তাই ব'লে কি ফির্‌বে তুমি ?
আছে, আছে স্থান॥

এসো, এসো, নায়ে।
ধূলা যদি থাকে কিছু
থাক্ না ধূলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা,
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল-জলদ বরণ
বসনখানি গায়ে।
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই,
এসো, এসো, নায়ে॥

যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তা'রা
কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষণেক-তরে
ব'স্‌বে আমার তরী-পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মান্‌বে না মোর মানা।
এলে যদি তুমিও এসো,
যাত্রী আছে নানা॥

কোথা তোমার স্থান ?
কোন্ গোলাতে রাখ্‌তে যাবে
একটি আঁটি ধান ?
ব'ল্‌তে যদি না চাও, তবে
শুনে আমার কী ফল হবে ;
ভাব্‌বো ব'সে খেয়া যখন
ক'র্‌বো অবসান—
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি
কোথা তোমার স্থান ?

(১৩০৬) —ক্ষণিকা

———

অতিথি

ঐ শোনো গো অতিথ্‌ বুঝি আজ,
এলো আজ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ।
শুন্‌চো না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনিঠিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা সাঁঝ।
পায়ে পায়ে বাজিয়োনাকো মল,
ছুটোনাকো চরণ চঞ্চল,
হঠাৎ পাবে লাজ।
ঐ শোনো গো অতিথ্‌ এলো আজ,
এলো আজ।
ওগো বধূ, রাখো তোমার কাজ,
রাখো কাজ॥

২

নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ, মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়।
আঁধার কিছু নাইকো আঙিনাতে,
আজকে আকাশ ফাগুন-পূর্ণিমাতে
আলোয় আলোময়।

না-হয় তুমি মাথায় ঘোম্‌টা টানি'
হাতে নিয়ো ঘরের প্রদীপখানি,
যদি শঙ্কা হয়।
নয় গো কভু বাতাস এ নয় নয়,
কভু নয়।
ওগো বধূ, মিছে কিসের ভয়,
মিছে ভয়॥

৩

না-হয় কথা কোয়ো না তা'র সনে,
পান্থ সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে।
প্রশ্ন যদি শুধায় কোনো-কিছু
নীরব থেকো মুখটি ক'রে নীচু
নম্র দু-নয়নে।
কাঁকন যেন ঝঙ্কারে না হাতে,
পথ দেখিয়ে আন্‌বে যবে সাথে
অতিথি সজ্জনে।
না-হয় কথা কোয়ো না তা'র সনে,
পান্থ সনে।
দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে,
দুয়ার-কোণে॥

৪

ওগো বধূ, হয়নি তোমার কাজ?
গৃহ-কাজ?

ঐ শোনো কে অতিথ্ এলো আজ,
এলো আজ।
সাজাওনি কি পূজারতির ডালা ?
এখনো কি হয়নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠগৃহের মাঝ ?
অতিযত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুর-বিন্দু আঁকো নাই কি শিরে ?
হয়নি সন্ধ্যাসাজ ?
ওগো বধূ, হয়নি তোমার কাজ ?
গৃহ-কাজ ?
ঐ শোনো কে অতিথ্ এলো আজ,
এলো আজ ॥

(১৩০৬) —ক্ষণিকা

মোহ

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে সর্ব্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

(*১৩০৬) —কণিকা

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর,
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ্‌ চাহি' রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥

২

ওই ডাকে শোন ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আন গোহালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি?
রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে॥

৩

শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে ?
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে।
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু'কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর-বেগে জলে পড়ি' জল
ছলছল উঠে বাজি' রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে॥

৪

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশী আর
নাহি রে।
ঝরঝর-ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ্‌ চাহি' রে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥

(১৩০৭) —ক্ষণিকা

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে ॥

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে ॥

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।
নয়নে লেগেছে।

নব তৃণদলে ঘন বনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে ॥

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে ?
ওগো নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি' ?
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে ?
ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে ?

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে
শ্যামল বসনে ?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণতলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে ?

ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ?

বিকচ-কেতকী তটভূমি-পরে
কে বেঁধেছে তা'র তরণী
তরুণ তরণী ?
রাশি রাশি তুলি' শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদল-রাগিণী সজল নয়নে
গাহিছে পরাণ-হরণী।
বিকচ-কেতকী তটভূমি-পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী ॥

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।

ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে,
তীর ছাপি' নদী কল-কল্লোলে
এলো পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

(১৩০৭) —ক্ষণিকা।

উদার-চরিতানাম্

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্র-হীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তা'রে কাননে সবাই—
সূর্য্য উঠি' বলে তা'রে—ভালো আছ ভাই?

(*১৩০৬) —কণিকা।

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তা'রেই বলি,
কালো তা'রে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘ্‌লা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোম্‌টা মাথায় ছিল না তা'র মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ॥

ঘন মেঘে আঁধার হ'লো দেখে
ডাক্‌তেছিলো শ্যামল দু'টি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটির হ'তে ত্রস্ত এলো তাই।
আকাশপানে হানি' যুগল ভুরু
শুন্‌লে বারেক মেঘের গুরু গুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ॥

পূবে বাতাস এলো হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।

আমার পানে দেখ্‌লে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ ॥

এম্‌নি ক'রে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এম্‌নি ক'রে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এম্‌নি ক'রে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ ॥

কৃষ্ণকলি আমি তা'রেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ ॥

(*১৩০৭) —ক্ষণিকা।

———

আবির্ভাব

বহুদিন হ'লো কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায় ;
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরাণে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়।
আজি জলভরা বরষায়॥

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনকাঞ্চল আবরণ,
নব-চম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘন নীল গুণ্ঠন তব
চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক আভরণ॥

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,—
নুয়ে নুয়ে যেতো ফুলদল।

শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি' বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিঃশ্বাস-পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল॥

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল ;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছো শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল ;
চরণে জড়ায়ে বনফুল॥

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে ব'সে
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখেনি সে গানের সুর
এ ছোটো বীণার ক্ষীণ তার ;
এ নহে তোমার উপহার॥

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মূরতি
দূরে করি' দিবে বরষণ,
মিলাবে চপল দরশন ?
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ ?
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ ;
বাসর ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন ;
এ কী রূপে দিলে দরশন ॥

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর
আয়োজন-হীন পরমাদ ;
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে
বন-বেতসের বাঁশীতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ ;
ক্ষমা করো যত অপরাধ ॥

আসো নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায় ;
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরাণ ভরি' যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়
আজি জলভরা বরষায় ॥

(*১৩০৭) —ক্ষণিকা।

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকানন-মাঝে,
হে কল্যাণী, নিত্য আছো
আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
আকুল হর্ষ-ভরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে ॥

২

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে,
পূজার সাজি ভরি';
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
বরণ-ডালা ধরি'।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব সুরের শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দু'টির মঙ্গল-গীত
উঠে মধুর স্বরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে ॥

৩

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি
হাসে চোখের পরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে॥

৪

নাই তো তোমার শীত বসন্ত,
নাই জরা যৌবন।
সর্ব্বঋতু সর্ব্বকালে
তোমার সিংহাসন।
নির্ব্বাণহীন প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি'
চির বিরাজ করে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে॥

৫

নদীর মতো এসেছিলে
গিরিশিখর হ'তে,
নদীর মতো সাগর-পানে
চলো অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে প'ড়্‌ছে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্য শীতল
তীর্থ-সলিল ঝরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে॥

৬

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্য-কুঞ্জবনে
গান-ফোটানো সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল
মুকুল খ'সে পড়ে ;
সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে॥

(*১৩০৭) —ক্ষণিকা।

মুক্তি

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তা'র মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

(*১৩০৭) —নৈবেদ্য

দীক্ষা

আঘাত-সংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি'।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলঙ্কাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি'
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি' নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি' দাও সক্ষম স্বাধীন॥

(*১৩০৭) —নৈবেদ্য।

ন্যায় দণ্ড

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছো নিজে, প্রত্যেকের পরে
দিয়েছো শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য্য করি
সবিনয়ে, তব কার্য্যে যেন নাহি ডরি
কভু কা'রে।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে ; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তা'রে তৃণ সম দহে॥

(প্র—বৈশাখ ১৩০৮) —নৈবেদ্য।

———

শৃণ্বন্তু বিশ্বে

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কী আনন্দ বলে
উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে,—"শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময় ; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।"

আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি'
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্ত্তা ?

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

(প্র—বৈশাখ ১৩০৮) —নৈবেদ্য।

শিক্ষা

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছো তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছো বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি' জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

ভোগেরে বেঁধেছো তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছো উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছো মঙ্গল,
শিখায়েছো স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে॥

(প্র—বৈশাখ ১৩০৮) —নৈবেদ্য

যুগান্তর

শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তা'র ভরি' তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হ'তে। লজ্জা সরম তেয়াগি'
জাতিপ্রেম নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি ॥

(প্র—বৈশাখ ১৩০৮) —নৈবেদ্য।

———

স্বার্থের সমাপ্তি

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি' চূর্ণ করে তা'রে
কাল-ঝঞ্ঝা-ঝঙ্কারিত দুর্য্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্দ্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট্ বিধান।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ-ক্ষুধানল
তত তা'র বেড়ে ওঠে,—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি' না করি' বিচার
জঠরে পূরিতে চায়।—বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দ্দয় নিলাজ,
তখন গর্জ্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।

ছুটিয়াছে জাতি-প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি' স্বার্থ-তরী, গুপ্ত পর্ব্বতের পানে॥

(*১৩০৭) —নৈবেদ্য।

প্রার্থনা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গন-তলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

(*১৩০৮) —নৈবেদ্য

অপরূপ

তোমায় চিনি ব'লে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে ;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়—
"কে গো সে"—শুধায় তব পরিচয়,
"কে গো সে ?"—
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "কি জানি, কি জানি"।
তুমি শুনে হাসো, তারা দূষে মোরে
কী দোষে ॥

তোমার অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।
গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে
পারিনি আপন প্রাণে।
কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে—
"যা গাহিছ তা'র অর্থ রয়েছে
কিছু কি ?"
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "অর্থ কি জানি !"
তারা হেসে যায়, তুমি হাসো ব'সে
মুচুকি' ॥

তোমায় জানি না চিনি না এ কথা বলো তো
কেমনে বলি ?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি' চাও,
খনে খনে যাও ছলি' ।
জ্যোৎস্না-নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোম্‌টা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে ।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি',
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি',
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছো চরণ
চকিতে ॥

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে ।
চিরকাল তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধ'রে ।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশীতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি ?
কাজ নাই, তুমি যা খুসি তা করো,
ধরা নাই দাও, মোর মন হরো,
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি' ॥

(*১৩০৮) —উৎসর্গ

পাগল

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী-মৃগ-সম।
ফাল্গুন-রাতে দক্ষিণ-বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।
বাহু মেলি' তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশী মম,
উতলা পাগল-সম।
যারে বাঁধি ধ'রে, তা'র মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না॥

(*১৩০৮) —উৎসর্গ।

সুদূর

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চ'লে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাসরি'॥

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ,
সে কথা যে যাই পা

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়,
তরু-মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি'।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাসরি'॥

(*১৩০৮) —উৎসর্গ।

ভক্তি ও অতিভক্তি

ভক্তি আসে রিক্তহস্ত প্রসন্নবদন,
অতিভক্তি বলে, দেখি কী পাইলে ধন।
ভক্তি কয়—মনে পাই, না পারি দেখাতে ;—
অতিভক্তি কয়, আমি পাই হাতে হাতে॥

(*১৩০৬) —কণিকা।

কুঁড়ি

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,—
কুসুমের দলে বন্ধ হ'য়ে
করুণ কাতর স্বনে
কহিছে সে—হায় হায়,
বেলা যায়, বেলা যায় গো,
ফাগুনের বেলা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা—
কুসুম ফুটিবে বাঁধন টুটিবে,
পূরিবে সকল কামনা।
নিঃশেষ হ'য়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না॥

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন মাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কি জানি কিসের কাজে।
কহিছে সে—হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়।

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা—
দখিন-পবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছে রে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চ'লে যাবে না॥

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে ব'সে—
ভাবিছে উদাস পারা,—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থ-হারা।
কহিছে সে—হায় হায়,
কেন আমি কাঁদি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা—
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পূরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি;
জনম ব্যর্থ যাবে না॥

(প্র—১৩০৯) —উৎসর্গ।

প্রবাসী

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লবো যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে তুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লবো বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তা'রে আমি ফিরি খুঁজিয়া॥

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারিনি তাদের আপন করিতে,
তা'রা নিশি-দিশি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে॥

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কবো তা কেমনে ?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে ॥

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।
যে ভাষায় তা'রা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি ;
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে !
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে ॥

সাত-মহলা ভবনে আমার,
চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে,—
দূরে এসে চাই ঘর বাঁধিবারে।
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির-জনমের ভিটাতে॥

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা;
ছোটো-বড়ো-হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা;
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা;
যেথা যাবো সেথা অসীম বাঁধনে
অন্ত-বিহীন আপনা॥

বিশাল বিশ্বে চারি দিক্ হ'তে
প্রতি-কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস্?
মোর তরে জল দু'হাত বাড়াস্?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির আহ্বান আনিছে।

র ভাবি যারে তা'রা বারেবারে
সবাই আমারে টানিছে ॥

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা-হিরণ-বরণী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বলো কারে ;
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি,
ধন্য এ মোর ধরণী ॥

(*১৩০৮) —উৎসর্গ।

মাঝারির সতর্কতা

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে ;—
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

(*১৩০৬) —কণিকা।

বিশ্বদেব

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে ?
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশীষ সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি' চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ-পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছো ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে॥

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়-গগনে
মুখ আপনার ঢাকি' আবরণে
হিরণ-কিরণে গাঁথা,—
তখন ভারতে শুনি চারিভিতে
মিলি' কাননের বিহঙ্গ-গীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রী-গাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব,
তব গান মোর স্বদেশে॥

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গল শঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণহুঙ্কার
ভেদি' বণিকের ধনঝঙ্কার
মহাকাশ-তলে উঠে ওঙ্কার
কোনো বাধা নাহি মানি'।

ভারতের শ্বেত হৃদি-শতদলে
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সঙ্গীত-তানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব্ব মহাবাণী।
নয়ন মুদিয়া ভাবীকাল-পানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গল বিজয়-শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে॥

(প্র—পৌষ ১৩০৯) —উৎসর্গ।

যথাকর্ত্তব্য

ছাতা বলে ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়,
এ অন্যায় অবিচার আমারে না সয়।
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,
রৌদ্র বৃষ্টি যত কিছু সব আমা-পরে!
তুমি যদি ছাতা হ'তে কী করিতে দাদা?
—মাথা কয়, বুঝিতাম মাথার মর্য্যাদা।
বুঝিতাম তা'র গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
মোর একমাত্র গুণ তা'রে রক্ষা করা॥

(*১৩০৬) —কণিকা

আবর্ত্তন

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কা'র যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

(প্র—পৌষ, ১৩০৯) —উৎসর্গ।

অতীত

কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন চেয়ে ব'সে রও ?
কথা কও, কথা কও।
যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর-তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তা'র স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার,—
তরঙ্গ-হীন ভীষণ মৌন ;
তুমি তারে কোথা লও ?
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও ॥

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও ?
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে।

হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হ'য়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও॥

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি
সব তুমি তুলে লও,—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছো
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হ'য়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও॥

(*১৩০৯) —উৎসর্গ।

মরণ-দোলা

চিরকাল এ কী লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছো গো, দোলা দিতেছো।
পলকে আলোকে তুলিছো, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছো।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সমুখে যেমন পিছেও তেমন,
মিছে করি মোরা গোল।
চিরকাল এ কী লীলা গো
অনন্ত কলরোল॥

ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও,
বাম হাত হ'তে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে করো কে বা জানে।
কোথা ব'সে আছো একেলা।
সব রবি শশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে করো এ খেলা।

খুলে দাও ক্ষণ-তরে,
ঢাকা দাও ক্ষণ-পরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারি কী ধন
কে লইল বুঝি হ'রে।
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে কথাটি কে বা জানে।
ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও,
বাম হাত হ'তে ডানে॥

এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছো পাশা।
আছে তো যেমন যা' ছিলো,
হারায়নি কিছু ফুরায়নি কিছু
যে মরিলো যে বা বাঁচিলো।
বহি' সব সুখ দুখ,
এ ভুবন হাসি-মুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে তা'র
ভরিয়া উঠেছে বুক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

(প্র—পৌষ, ১৩০৯) —উৎসর্গ

মরণ

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ;
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ?
যবে সন্ধ্যা-বেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি পাশে আসি' বসো অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

হায় এমনি ক'রে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি' হৃদিতলে অবতরণ?
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষ-শোণিতে?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণী-রণরণিতে?
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ?
আমি বুঝি না যে কেন আসো-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তার সমারোহ-ভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি' বাঁধা হবে না ?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ব'বে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরণ ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ?

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ;
তাঁর কতমতো ছিলো আয়োজন,
ছিলো কত শত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি' রহি' গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি' জটাজাল
যত ভুজঙ্গ-দল তরজে।
তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

শুনি', শ্মশানবাসীর কলকল
　　ওগো মরণ, হে মোর মরণ ;
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
　　তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
　　তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
　　তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি' কর,
　　ক্ষেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
　　ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

তুমি চুরি করি' কেন এসো চোর
　　ওগো মরণ, হে মোর মরণ ?
শুধু নীরবে কখন্ নিশি ভোর,
　　শুধু অশ্রু-নিঝর-ঝরণ।
তুমি উৎসব করো সারারাত
　　তব বিজয়-শঙ্খ বাজায়ে।
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি' হাত
　　নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
　　আমি নিজে লবো তবশরণ
যদি গৌরবে মোরে ল'য়ে যাও
　　ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ;
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধ-জাগরূক নয়নে,—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি' প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

আমি যাবো, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ;
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি' আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি' মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

(প্র—ভাদ্র, ১৩০৯) —উৎসর্গ।

হিমাদ্রি

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়-পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কী বাণীর সন্ধানে।
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি' আপনার
সহসা মুহূর্ত্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণী-ধারা।

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দ্দম অগ্নিতাপ-বেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হ'য়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ।
পেয়েছো আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমা-বিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছো সঁপিয়া।

(প্র—শ্রাবণ, ১৩১০) —উৎসর্গ।

শিলালিপি

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জ্জনে
পাঠকের মতো তুমি ব'সে আছো অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছো অঙ্ক-পরে।
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
গেল এলো কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ।
আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেম-গাথা?
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্ব্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে? কিছু নাহি চাহি যাঁর,
তিনি কেন চাহিলেন—ভালো বাসিলেন নির্ব্বিকার,—
পরিলেন পরিণয়-পাশ? এই যে প্রেমের লীলা,—
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা।

(প্র—শ্রাবণ, ১৩১০) —উৎসর্গ

তপোমূৰ্ত্তি

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মতো। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জ্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্ম-বিসর্জ্জনে।
তোমার সহস্রশৃঙ্গ বাহু তুলি' কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—"শুন শুন বিশ্বজন সবে,
জেনেছি, জেনেছি আমি।" যে ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিলো ভারতের বিরাট্ গভীর বক্ষ হ'তে
আদি-অন্তবিহীনের অখণ্ড অমৃত লোক পানে,
সে আজি উঠিছে বাজি', গিরি, তব বিপুল পাষাণে।
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষা-হারা মহাবার্ত্তা প্রকাশিতে করেছে আকূতি,
সেই বহ্নি-বাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।

(প্র—শ্রাবণ, ১৩১০) —উৎসর্গ।

মৃত্যু-মাধুরী

তুমি মোর জীবনের মাঝে
 মিশায়েছো মৃত্যুর মাধুরী।
চির-বিদায়ের আভা দিয়া
রাঙায়ে গিয়েছো মোর হিয়া,
এঁকে গেছো সব ভাবনায়
 সূর্য্যাস্তের বরণ-চাতুরী।
জীবনের দিক্‌চক্র-সীমা
লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা,
অশ্রু-ধৌত হৃদয়-আকাশে
 দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী।
তুমি মোর জীবনের মাঝে
 মিশায়েছো মৃত্যুর মাধুরী॥

তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
 মরণেরে করেছো মঙ্গল।
জীবনের পর পার হ'তে
প্রতিক্ষণে মর্ত্ত্যের আলোতে
পাঠাইছো তব চিত্তখানি
 মৌনপ্রেমে সজল-কোমল
মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে
ব'সে আছো বাতায়ন-পরে,

জ্বালায়ে রেখেছো দীপখানি
   চিরন্তন আশায় উজ্জ্বল।
তুমি ওগো কল্যাণরূপিণী
   মরণেরে করেছো মঙ্গল॥

তুমি মোর জীবন মরণ
   বাঁধিয়াছ দু'টি বাহু দিয়া।
প্রাণ তব করি' অনাবৃত
মৃত্যুমাঝে মিলালে অমৃত,
মরণেরে জীবনের প্রিয়
   নিজ হাতে করিয়াছ, প্রিয়া।
খুলিয়া দিয়াছ দ্বারখানি,
যবনিকা লইয়াছ টানি',
জন্ম-মরণের মাঝখানে
   নিস্তব্ধ রয়েছো দাঁড়াইয়া।
তুমি মোর জীবন-মরণ
   বাঁধিয়াছ দু'টি বাহু দিয়া॥

(প্র—পৌষ, ১৩০৯) —স্মরণ।

চিঠি

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি—
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি
স্মৃতির খেলেনা ক'টি বহু যত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি' রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবি চন্দ্র তারা
তারি কাছ হ'তে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই ক'টি তুচ্ছ বস্তু চুরি ক'রে ল'য়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,—বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে।
আশ্রয় আজিকে তা'রা পাবে কার কাছে ?
জগতের কারো নয়, তবু তারা আছে।
তাদের যেমন তব রেখেছিলো স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ ?

(প্র—পৌষ, ১৩০৯) —স্মরণ।

শিশুলীলা

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথায় পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারাবেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা॥

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল পরি
ভাসায় তা'রা খেলার তরী,
আপন হাতে হেলায় গড়ি'
পাতায়-গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা॥

জানে না তা'রা সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে;
বণিক্ ধায় তরণী বেয়ে;

ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি' ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তাঁরা,
জানে না জাল ফেলা॥

ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাথা তরল তানে
দোলনা ধরি' যেমন গানে
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা॥

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে ;
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা॥

(১৩১০) —শিশু।

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তা'র বুকে বেঁধে,—
"ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
ভোরে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালোবাসায়,
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরাণে—
পুরাণো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের পরে
কতকাল যে লুকিয়েছিলি কে জানে!

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিলো প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,

আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হ'তে
এসেছিস্ আনন্দ-স্রোতে
নূতন হ'য়ে আমার বুকে বিলসি'।

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝিনে রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে ?
ওই দেহে এই দেহ চুমি'
মায়ের খোকা হ'য়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে।

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু স'রে দাঁড়ালে।
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখ্‌বো বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু-দু'টির আড়ালে॥"

(*১৩১০) —শিশু।

কেন মধুর

রঙীন্‌ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে, বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং উঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে ॥

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়-মাঝে বুঝি রে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজ মনে তরল রবে,
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে ॥

যখন নবনী দিই লোলুপ করে
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘুরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে ॥

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি, তখনি জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত[illegible]ানি'—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি ॥

(*১৩১০) —শিশু।

ছুটির দিনে

ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এলো আলো ;
আজ্‌কে আমার ছুটোছুটি
লাগ্‌লো না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন্‌
অনেক হ'লো বেলা,
তোমায় মনে প'ড়ে গেল
ফেলে এলেম খেলা
আজ্‌কে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি ;
কাজ যা আছে সব রেখে আয়
মা, তোর পায়ে লুটি।
দ্বারের কাছে এইখানে বোস্‌
এই হেথা চৌকাঠ ;
বল্‌ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ

ঐ দেখ মা বর্ষা এলো
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলী ধায় এঁকে বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।

দেব্‌তা যখন ডেকে ওঠে,—
থরথরিয়ে কেঁপে
ভয় ক'র্‌তেই ভালোবাসি
তোমায় বুকে চেপে।
ঝুপ্‌ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুন্‌তে ভালোবাসি
ব'সে কোণের ঘরে।
ঐ দেখ মা জান্‌লা দিয়ে
আসে জলের ছাট,
বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ॥

কোন্‌ সাগরের তীরে মা গো
কোন্‌ পাহাড়ের পারে,
কোন্‌ রাজাদের দেশে মা গো
কোন্‌ নদীটির ধারে।
কোনোখানে আল বাঁধা তা'র
নাই ডাহিনে বাঁয়ে?
পথ দিয়ে তা'র সন্ধ্যাবেলায়
পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে?
সারাদিন কি ধুধু করে
শুক্‌নো ঘাসের জমি?
একটি গাছে থাকে শুধু
ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি?

সেখান দিয়ে কাঠকুড়ানী
যায় না নিয়ে কাঠ ?
বল্ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ ॥

এম্‌নিতর মেঘ ক'রেছে
সারা আকাশ ব্যেপে ;
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তা'র
বুকের পরে নাচে,
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ্ পেলে কার কাছে ?
মেঘে যখন ঝিলিক্ মারে
আকাশের এক কোণে।
দুয়োরাণী-মায়ের কথা
পড়ে না তা'র মনে ?
দুখিনী মা গোয়াল-ঘরে
দিচ্ছে এখন ঝাঁট,
রাজপুত্তুর চলে যে কোন্
তেপান্তরের মাঠ ?

ঐ দেখ মা গাঁয়ের পথে
লোক নেইকো মোটে ;
রাখাল-ছেলে সকাল ক'রে
ফিরেছে আজ গোঠে।

আজ্‌কে দেখ রাত হ'লো যে
দিন না যেতে যেতে,
কৃষাণেরা ব'সে আছে
দাওয়ায় মাত্রর পেতে।
আজ্‌কে আমি লুকিয়েছি মা,
পুঁথি-পত্তর যত,—
পড়ার কথা আজ বোলো না,
যখন বাবার মতো—
বড়ো হবো, তখন আমি
প'ড়্‌বো প্রথম পাঠ,—
আজ বলো মা কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ॥

(*১৩১০) —শিশু।

একই পথ

দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।

(*১৩০৬) —কণিকা।

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই;
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাক্‌বি যখন খোকা ব'লে
ব'ল্‌বো আমি—নাই সে খোকা নাই;
মা গো যাই।

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে
যাবো মা তোর বুকে ব'য়ে
ধ'র্‌তে আমায় পার্‌বিনে তো হাতে।
জলের মধ্যে হবো মা ঢেউ
জান্‌তে আমায় পার্‌বে না কেউ,
স্নানের বেলা খেল্‌বো তোমার সাথে।

বাদ্‌লা যখন প'ড়্‌বে ঝ'রে
রাতে শুয়ে ভাব্‌বি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাবো ঐ বনে।
জান্‌লা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক্‌ মেরে যাবো দেখে,
আমার হাসি প'ড়্‌বে কি তোর মনে?

খোকার লাগি' তুমি মা গো
অনেক রাতে যদি জাগো

তারা হ'য়ে ব'ল্‌বো তোমায় "ঘুমো" ;
তুই ঘুমিয়ে প'ড়্‌লে পরে
জ্যোৎস্না হ'য়ে ঢুক্‌বো ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাবো চুমো ॥

স্বপন হ'য়ে আঁখির ফাঁকে,
দেখ্‌তে আমি আস্‌বো মাকে,
যাবো তোমার ঘুমের মধ্যিখানে,
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখ্‌বে পাশে,
মিলিয়ে যাবো কোথায় কে তা জানে ॥

পূজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
ব'ল্‌বে—খোকা নেই যে ঘরের মাঝে।
আমি তখন বাঁশীর সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফির্‌বো সকল কাজে ॥

পূজোর কাপড় হাতে ক'রে
মাসী যদি শুধায় তোরে,
"খোকা তোমার কোথায় গেল চ'লে?"
বলিস, খোকা সে কি হারায় ;
আছে আমার চোখের তারায়
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে ॥

(*১৩১০) —শিশু।

শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোম্‌টা-পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার-মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাবো রে আজ ঘর-ছাড়া,
সন্ধ্যা আসে, দিন যে চ'লে যায়।
ও রে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায়॥

সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ও-পার হ'তে এক-টানা
একটি দু'টি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন ক'রে চিন্‌বো ও রে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিলো আমার দেশে!
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁসে
ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়,
ডাক্‌লে আমি ক্ষণেক থামি' হেথায় পাড়ি ধ'র্‌বে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায়?
ও রে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায়॥

ঘরেই যারা যাবার তা'রা কখন্ গেছে ঘর-পানে
পারে যারা যাবার, গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তা'রে !
ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফ'ল্‌লো না,
অশ্রু যাহার ফেল্‌তে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁজের আলো জ্ব'ল্‌লো না
সেই ব'সেছে ঘাটের কিনারায়।
ও রে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায় ॥

(প্র—আষাঢ়, ১৩১২) —খেয়া।

স্পর্দ্ধা

হাউই কহিল, মোর কী সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে—ত'ার গায়ে লাগেনাকো কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।

(*১৩০৬) —কণিকা।

শুভক্ষণ

ওগো মা,

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর

ঘরের সমুখ পথে,

আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ ল'য়ে

রহিব বলো কী মতে?

ব'লে দে আমায় কী করিব সাজ,

কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লবো আজ,

পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে

কোন্ বরণের বাস?

মা গো, কী হ'লো তোমার, অবাক্-নয়নে

মুখ-পানে কেন চাস্?

আমি দাঁড়াবো যেথায় বাতায়ন-কোণে

সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,

ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ

যাবে সে সুদূর পুরে ;—

শুধু সঙ্গের বাঁশী কোন্ মাঠ হ'তে

বাজিবে ব্যাকুল সুরে।

তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর

ঘরের সমুখ পথে,

শুধু সে নিমেষ লাগি' না করিয়া বেশ

রহিব বলো কী মতে?

(প্র—অগ্রহায়ণ, ১৩১২) —খেয়া।

ত্যাগ

ওগো মা,

রাজার দুলাল গেল চলি' মোর

ঘরের সমুখ পথে,

প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার

স্বর্ণ-শিখর রথে।

ঘোম্‌টা খসায়ে বাতায়নে থেকে

নিমেষের লাগি' নিয়েছি মা দেখে,

ছিঁড়ি' মণিহার ফেলেছি তাহার

পথের ধূলার পরে।

মা গো, কী হ'লো তোমার, অবাক্-নয়নে

চাহিস্ কিসের তরে ?

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে

রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,

চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে

প'ড়ে আছে শুধু আঁকা।

আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ

ধূলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল গেল চলি' মোর

ঘরের সমুখ পথে—

মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া

রহিব বলো কী মতে ?

(প্র—অগ্রহায়ণ, ১৩১২) —খেয়া।

আগমন

তখন রাত্রি আঁধার হ'লো
সাঙ্গ হ'লো কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম
আস্‌বে না কেউ আজ।
মোদের গ্রামে দুয়ার যত
রুদ্ধ হ'লো রাতের মতো,
দুয়েক জনে বলেছিলো
"আস্‌বে মহারাজ।"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"আস্‌বে না কেউ আজ॥"

দ্বারে যেন আঘাত হ'লো
শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম
বাতাস বুঝি হবে।
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
শুয়েছিলেম আলসভরে,
দুয়েক জনে বলেছিলো
"দূত এলো বা তবে।"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"বাতাস বুঝি হবে॥"

নিশীথ রাতে শোনা গেলো
কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি'
কাঁপ্‌লো ধরা থরহরি,
দুয়েক জনে বলেছিলো
"চাকার ঝনঝনি।"
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা
"মেঘের গরজনি॥"

তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠ্‌লো ভেরী,
কে ফুকারে—"জাগো সবাই,
আর কোরো না দেরি।"
বক্ষ-পরে দু'হাত চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে—
"রাজার ধ্বজা হেরি।"
আমরা জেগে উঠে বলি
"আর্ তবে নয় দেরি॥"

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন;
রাজা আমার দেশে এলো
কোথায় সিংহাসন।

হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা ;
দুয়েক জনে কহে কানে—
"বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্ত-করে শূন্যঘরে
করো অভ্যর্থন ॥"

ওরে দুয়ার খুলে দে রে—
বাজা শঙ্খ বাজা ;
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখরাতের রাজা ॥

(প্র—আশ্বিন, ১৩১২) —খেয়া।

———

দান

ভেবেছিলাম চেয়ে নেবো—
চাই নি সাহস ক'রে—
সন্ধ্যেবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে প'রে—
আমি চাই নি সাহস ক'রে।
ভেবেছিলাম সকাল হ'লে
যখন পারে যাবে চ'লে
ছিন্নমালা শয্যাতলে
রইবে বুঝি প'ড়ে।
তাই আমি কাঙালের মতো
এসেছিলাম ভোরে—
তবু চাই নি সাহস ক'রে॥

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্ব'লে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।
তরুণ আলো জাল্না বেয়ে
প'ড়্লো তোমার শয়ন ছেয়ে
ভোরের পাখী শুধায় গেয়ে
"কী পেলি তুই নারী?"

নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি ॥

তাই তো আমি ভাবি ব'সে
একি তোমার দান ?
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
নাই যে হেন স্থান।
ওগো এ কি তোমার দান ?
শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভূষণ কি আমায় সাজে ?
রাখ্‌তে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইবো বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান ॥

আজ্‌কে হ'তে জগৎ-মাঝে
ছাড়্‌বো আমি ভয়,
আজ হ'তে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়্‌বো সকল ভয়।

মরণকে মোর দোসর ক'রে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তা'রে বরণ ক'রে
রাখ্‌বো পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার
ক'র্‌বে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়্‌বো সকল ভয়॥

তোমার লাগি' অঙ্গ ভরি'
ক'র্‌বো না আর সাজ।
নাই বা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয়রাজ।
আমি ক'র্‌বো না আর সাজ।
ধূলায় ব'সে তোমার তরে
কাঁদ্‌বো না আর একূলা ঘরে,
তোমার লাগি' ঘরে পরে
মান্‌বো না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিলে আজ,
অমি ক'র্‌বো না আর সাজ।

(প্র—অগ্রহায়ণ, ১৩১২) —খেয়া।

বালিকা বধূ

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধি-বিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তা'র
খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু॥

জানে না করিতে সাজ;
কেশ বেশ তা'র হ'লে একাকার
মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া,
ধুলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া,
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন
ঘরকরণের কাজ।
জানে না করিতে সাজ॥

কহে এরে গুরুজনে
"ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা।"
ভীত হ'য়ে তাহা শোনে।
কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
খেলা ফেলি' কভু মনে পড়ে তা'র—
"পালিব পরাণ-পণে
যাহা কহে গুরুজনে॥"

বাসকশয়ন-পরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও
অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়
কত শুভক্ষণ বৃথা চলি' যায়,
যে হার তাহারে পরালে, সে হার
কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশয়ন-পরে॥

শুধু দুর্দ্দিনে ঝড়ে
—দশ দিক্ ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধূলা কোথা প'ড়ে থাকে তা'র
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে॥

মোরা মনে করি ভয়,
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাসো,
এই দেখিতেই বুঝি ভালোবাসো,
খেলাঘর-দ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে
কী যে পাও পরিচয়।
মোরা মিছে করি ভয়॥

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়ন-তলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি' মানিবে তখন
ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে॥

ওগো বর, ওগো বঁধু,
জানো জানো তুমি—ধুলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছো সাজায়ে নির্জ্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছো
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বঁধু॥

(প্র—মাঘ, ১৩১২) —খেয়া।

কৃপণ

ভিক্ষা ক'রে ফির্‌তেছিলেম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব্ব এক স্বপ্নসম
লাগ্‌তেছিলো চক্ষে মম
কী বিচিত্র শোভা তোমার
কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাব্‌তেছিলেম
এ কোন্ মহারাজ।
শুভক্ষণে রাত পোহালো
ভেবেছিলেম তবে,
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে
ফির্‌তে নাহি হবে।
বাহির হ'তে নাহি হ'তে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধন ধান্য
ছড়াবে দুইধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেবো,
নেবো ভারে ভারে।

সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখ-পানে চেয়ে
নাম্‌লে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা ;
হেনকালে কিসের লাগি'
তুমি অকস্মাৎ
"আমায় কিছু দাও গো" ব'লে
বাড়িয়ে দিলে হাত।
এ কী কথা রাজাধিরাজ,
"আমায় দাও গো কিছু !"
শুনে ক্ষণকালের তরে
রৈনু মাথা নীচু।
তোমার কী বা অভাব আছে
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে ?
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হ'তে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা।
পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—এ কী,
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।

দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে
স্বর্ণ হ'য়ে এলো ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দু'টি নয়ন ভ'রে—
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য ক'রে।

(*১৩১২) —খেয়া।

সৌন্দর্য্যের সংযম

নর কহে—বীর মোরা যাহা ইচ্ছা করি।
নারী কহে জিহ্বা কাটি'—শুনে লাজে মরি।
পদে পদে বাধা তব—কহে তা'রে নর।
কবি কহে — তাই নারী হয়েছে সুন্দর।

(*১৩০৬) —কণিকা।

ফুল ফোটানো

তোরা কেউ পার্‌বি নে গো
পার্‌বি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস্‌, যতই করিস্‌,
যতই তা'রে তুলে ধরিস্‌,
ব্যগ্র হ'য়ে রজনী দিন
আঘাত করিস্‌ বোঁটাতে,
তোরা কেউ পার্‌বি নে গো
পার্‌বি নে ফুল ফোটাতে॥

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
ম্লান ক'র্‌তে পারিস্‌ তা'রে,
ছিঁড়্‌তে পারিস্‌ দলগুলি তা'র,
ধূলায় পারিস্‌ লোটাতে,
তোদের বিষম গণ্ডগোলে
যদিই বা সে মুখটি খোলে,
ধ'র্‌বে না রঙ্‌—পার্‌বে না তা'র
গন্ধটুকু ছোটাতে।
তোরা কেউ পার্‌বি নে গো
পারবি নে ফল ফোটাতে॥

যে পারে সে আপ্‌নি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দু'টি চোখের কিরণ ফেলে,
অম্‌নি যেন পূর্ণ-প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপ্‌নি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে॥

নিঃশ্বাসে তা'র নিমেষেতে
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
পাতার পাখা মেলে দিয়ে
হাওয়ায় থাকে লোটাতে।
রঙ্‌ যে ফুটে ওঠে কত
প্রাণের ব্যাকুলতার মতো,
যেন কারে আন্‌তে ডেকে
গন্ধ থাকে ছোটাতে।
যে পারে সে আপ্‌নি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

(*১৩১২) —খেয়া।

"সব-পেয়েছি"র দেশ

সব-পেয়েছির দেশে কারো
নাই রে কোঠাবাড়ী,
তুয়ার খোলা প'ড়ে আছে,
কোথায় গেলো দ্বারী?
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়
হস্তীশালায় হাতী,
স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে
জ্বালায় না কেউ বাতি।
রমণীরা মোতির সিঁথি
পরে না কেউ কেশে,
দেউলে নেই সোনার চূড়া
সব-পেয়েছির দেশে।

পথের ধারে ঘাস উঠেছে
গাছের ছায়াতলে.
স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা
পাশ দিয়ে তা'র চলে।
কুটীরেতে বেড়ার পরে
দোলে ঝুম্‌কা-লতা;
সকাল হ'তে মৌমাছিদের
ব্যস্ত ব্যাকুলতা।

ভোরের বেলা পথিকেরা
কী কাজে যায় হেসে—
সাঁঝে ফেরে বিনা-বেতন
সব-পেয়েছির দেশে।

আঙিনাতে দুপুর বেলা
মৃদুকরুণ গেয়ে
বকুলতলায় ছায়ায় ব'সে
চর্‌কা কাটে মেয়ে।
মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে
নতুন কচি ধানে,
কিসের গন্ধ কাহার বাঁশী,
হঠাৎ আসে প্রাণে!
নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
সব-পেয়েছির দেশে।

সদাগরের নৌকা যত
চলে নদীর পরে—
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ
কেনাবেচার তরে।
সৈন্যদলে উড়িয়ে ধ্বজা
কাঁপিয়ে চলে পথ;
হেথায় কভু নাহি থামে
মহারাজের রথ।

এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখ্‌তে না পায় কী আছে এই
সব-পেয়েছির দেশে।

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি,
নাইকো হাটে গোল,
ওরে কবি, এইখানে তোর
কুটীরখানি তোল্‌।
ফেল্‌ রে ধুয়ে পায়ের ধুলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা,
বেঁধে নে তোর সেতারখানা
রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে ব'স্‌ রে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে।

(প্র—শ্রাবণ, ১৩১৩) —খেয়া।

ভারত-তীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'লো হারা।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন —
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'লো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে ॥

রণধারা বাহি' জয়গান গাহি'
উন্মাদ কলরবে
ভেদি' মরুপথ গিরি পর্ব্বত
যারা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তা'র বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি' দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে ॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা-বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট্ হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে ॥

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে
দুখের রক্তশিখা,
হবে না সহিতে মর্ম্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে যাক্।

দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ !
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে ॥

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমানভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ-নীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে ॥

(১৮ আষাঢ়, ১৩১৭) —গীতাঞ্জলি

অপমান

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছো অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছো যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥

তোমার আসন হ'তে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হ'য়ে
ধুলায় সে যায় ব'য়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হ'তে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছো যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান॥

শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও করো না নমস্কার।
তবু নত করি' আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান্!
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান॥

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাকো,
এখনো সরিয়া থাকো,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

(২০ আষাঢ়, ১৩১৭) —গীতাঞ্জলি।

আত্মবিক্রয়

"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমন ক'রে হায়, আমার
দিন যে চ'লে যায়,
মাথার পরে বোঝা আমার বিষম হ'লো দায়।
কেউবা আসে, কেউবা হাসে, কেউবা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট মাথে অস্ত্র হাতে রাজা এলো রথে।
ব'ল্‌লে হাতে ধ'রে, "তোমায়
কিন্‌বো আমি জোরে।"
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেলো টানাটানি ক'রে।
মুকুট মাথে ফির্‌লো রাজা সোনার রথে চ'ড়ে।

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফির্‌তেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এলো হাতে টাকার থলি।
ক'র্‌লে বিবেচনা, ব'ল্‌লে
"কিন্‌বো দিয়ে সোনা।"
উজাড় ক'রে দিয়ে থলি ক'র্‌লে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুল-ভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এলো বকুলতলার কাছে।
ব'ল্‌লে কাছে এসে, "তোমায়
কিন্‌বো আমি হেসে।"
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এলো শেষে ;
ধীরে ধীরে ফিরে গেলো বন-ছায়ার দেশে॥

সাগরতীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে' ব'ল্‌লে
"অম্‌নি নেবো কিনে।"
বোঝা আমার খালাস হ'লো তখনি সেই দিনে,
খেলার সুখে বিনা মূল্যে নিল আমায় জিনে॥

(আষাঢ়, ১৩১৯) —গীতিমাল্য।

নিজের ও সাধারণের

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে।

(*১৩০৬) —কণিকা।

যাত্রাশেষ

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে॥

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারা-দীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে॥

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা ;
অঙ্গুলি তুলি' তারাগুলি অনিমেষে
মা ভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া ;
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা ॥

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিলো সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি'।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায়-বেলায় আজিও রহিল বাকি ॥

যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেলো চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল প'ড়ে,
যে মণি দুলিলো, যে ব্যথা বিঁধিলো বুকে,
ছায়া হ'য়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে ॥

(২রা কার্তিক, ১৩২১) —গীতালি।

নবীন

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক্ তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

খাঁচাখানা দুল্‌ছে মৃদু হাওয়ায়।
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে-আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

বাহির পানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।

চ'ল্‌তে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

তোরে হেথায় ক'র্‌বে সবাই মানা,
হঠাৎ আলো দেখ্‌বে যখন
ভাব্‌বে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠ্‌বে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আস্‌বে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগ্‌বে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা॥

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি'।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে;
বিবাগী কর্ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী।
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস্ ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস্ আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা।
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা॥

(১৫ বৈশাখ, ১৩২১) —বলাকা।

———

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে,
কেমন ক'রে সইবো ?
বাতাস আলো গেলো ম'রে,
এ কী রে দুর্দ্দৈব !
ল'ড়্‌বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেয়ে,
চ'ল্‌বি যারা চল্‌ রে ধেয়ে,
আয় না রে নিঃশঙ্ক,
ধূলায় প'ড়ে রইলো চেয়ে
ঐ যে অভয় শঙ্খ ॥

চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হবো নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা ?
এই কি আমার সন্ধ্যা ?
গাঁথ্‌বো রক্ত-জবার মালা ?
হায় রজনীগন্ধা !
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাবো বিরাম খুঁজি',
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লবো তোমার অঙ্ক।
হেন কালে ডাক্‌লো বুঝি
নীরব তব শঙ্খ ॥

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ ;
দীপক-তানে উঠুক্ ধ্বনি'
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুল্‌বো ধ'রে
তোমার জয়শঙ্খ ॥

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারা সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।

কেউ বা ছুটে আস্‌বে পাশে,
কাঁদ্‌বে.বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপ্‌বে ত্রাসে
সুপ্তির পালঙ্ক।
বাজ্‌বে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ ॥

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রবো,
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
বাজ্‌বে জয়ডঙ্ক।
দেবো সকল শক্তি, লবো
অভয় তব শঙ্খ ॥

(১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) —বলাকা।

পাড়ি

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আস্‌ছে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালী-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্চ্ছি' পড়ে সাগর সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল ক্ষেপেছে, না পায় তা'রা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দ্দিনে ভাব্‌ল মনে কী সে
কূল-ছাড়া মোর নেয়ে?

এমন রাতে উদাস হ'য়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে?
শাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আস্‌ছে তরী বেয়ে।
কোন্ ঘাটে যে ঠেক্‌বে এসে কে জানে তা'র পাতি,
পথ্-হারা কোন্ পথ দিয়ে সে আস্‌বে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে?
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব ক'র্‌বে আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে॥

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
বিবাগী মোর নেয়ে ?
নাহি জানি পূর্ণ ক'রে কোন্ রতনের বোঝা
আস্‌ছে তরী বেয়ে ?
নহে নহে, নাইকো মাণিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আন্‌মনে গান গেয়ে।
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হ'লো নেয়ে।
তা'রি লাগি' পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আস্‌ছে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তা'র বাতাস চলে হাঁকি',
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপ্‌ছে থাকি' থাকি'
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জানো না তাহারি নাম ডাকি'
ঐ যে আসে নেয়ে ॥

অনেক দেরি হ'য়ে গেছে বাহির হ'লো কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয়নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে
আস্‌তে তরী বেয়ে।
বাজ্‌বে নাকো তূরী ভেরী, জান্‌বে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভ'র্‌বে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক-পরশ পেয়ে।
নীরবে তা'র চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আস্‌বে নেয়ে॥

(৫ই ভাদ্র, ১৩২১ —বলাকা।

চালক

অদৃষ্টেরে শুধালেম—চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল ফিরে দেখ।—দেখিলাম থামি'
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

(*১৩০৬) —কণিকা।

ছবি

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা?
—ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা ক'রে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হ'য়ে রও?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন,
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হ'তে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে?
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি'
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি'
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে
অঙ্গে তা'র পত্রলিখা দেয় লিখে

বসন্তের মিলন-উষায়;
এই ধূলি এও সত্য হায়।
এই তৃণ
বিশ্বের চরণ-তলে লীন,
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি।
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল;
সে যে আজ হ'লো কত কাল!
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে!
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি' রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্ত্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি'।
তা'র পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে ;
পথের দু'ধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে ;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হ'তে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হ'তে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছো থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি ?
তুমি ছবি ?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছো স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে ?
মরি ম র সে আনন্দ থেমে যেতো যদি
এই নদী
হারাতো তরঙ্গবেগ ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিতো তা'র সোনার লিখন।
তোমার চিকণ
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হ'তে যদি মিলাইতো
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হ'তো স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছো বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল ?
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি' দেয় সুর।

ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি' রক্তে মোর দিয়েছো যে দোলা।
নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তা'র অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তা'র পরে হারায়েছি রাতে।
তা'র পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

(৩রা কার্ত্তিক, ১৩২১) —বলাকা।

———

শা-জাহান

এ-কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্, সম্রাটের ছিলো এ সাধনা।
রাজ-শক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন ;
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ—
এই তব মনে ছিলো আশ।
হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক,
শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাহি যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছো সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য ক'রে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ-প্রান্তে ফেলে যেতে হয়—
নাই নাই, নাই যে সময়।
হে সম্রাট্, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিলো করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।

কণ্ঠে তা'র কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপ-হীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন-জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্না-রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট্ কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া

প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্য-দূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চ'লে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে ;
সব সৈন্যদল—
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল—
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি-পরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায় না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুর-নিক্কণ
ভগ্নপ্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।

তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন,
তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙা-গড়া
তুচ্ছ করি' জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলো নাই?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির
ধরার ধূলায় থাকি'
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি-তারা ডাকিছে তাহারে।
তা'র নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।

স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্র-স্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট্, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।
যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।
প্রিয়া তা'রে রাখিল না, রাজ্য তা'রে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র-পর্ব্বত।
আজি তা'র রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার-পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি প'ড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

(১৪ কার্ত্তিক ১৩২১) —বলাকা।

চঞ্চলা

হে বিরাট্ নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্বুদের মতো।
হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছো যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্ব্বনাশা প্রেম তা'র, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া !
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষহারে

ঘন ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝ'ড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বারম্বার ঝ'রে ঝ'রে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হ'তে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, করো না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্তে কিছু তব নাই ;
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি'

পলকে পলকে,—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি',
তখনি চমকি'
উচ্ছি্রয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;—
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্ম-মূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য-মন্দাকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি'
তুলিতেছে শুচি করি'
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্ম্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।
ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কার-মুখরা এই ভুবন-মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি'।

নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে,
গান হ'তে গানে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হ'য়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর প'ড়ে থাক তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে !
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোবে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

(৩রা পৌষ, ১৩২১) —বলাকা।

দান

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান ?
প্রভাতের গান ?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির পরে ;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে ?
কী তোমারে দিব আনি' ?
সন্ধ্যা-দীপখানি ?
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার ?
হোক ফুল, হোক না গলার হার
তা'র ভার
কেনই বা সবে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তা'রা ম্লান ছিন্ন হবে।
নিজ হ'তে তব হাতে যাহা দিব তুলি'
তা'রে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি',—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হ'য়ে যাবে ধূলি।

তা'র চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপনগন্ধে পুলকে চমকি'
দাঁড়াবে থমকি',
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর,
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হ'তে খসা
একটি রঙীন আলো কাঁপি' থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,

সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি' দিয়া সুরে
চ'লে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হ'তে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান।

(১০ই পৌষ, ১৩২১) —বলাকা।

———

বিচার

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কা'রা সবে ধূলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায়।
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার।—
তা'র পরে দেখি,
এ কী,
খোলা তব বিচার-ঘরের দ্বার,—
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের পরে ;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজা-দীপমালা

তাদের মত্ততাপানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধূলা দিয়ে যারা চ'লে যায়।
হে সুন্দর,
তোমার বিচার-ঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্য সমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গ-গুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গ-কূজনে,
তরঙ্গ-চুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব-বীজনে।

প্রেমিক আমার,
তা'রা যে নির্দ্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্ব্বার,
লুকায়ে ফেরে যে তা'রা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্ব্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে ;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধরো, প্রেমিক আমার,
করো গো বিচার।

তা'র পরে দেখি
এ কী,
কোথা তব বিচার-আগার ?
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা-পরে ;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহ-শেল ক্ষতবক্ষে করি' লয় গ্রাস।
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার-আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনা-মাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে
সখার হৃদয়-রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রু-প্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তা'রা, মুগ্ধ তা'রা, হ'য়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সঙ্গোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।
চোরা-ধন দুর্ব্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।

তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার,—
এদের মার্জ্জনা করো হে রুদ্র আমার।
চেয়ে দেখি মার্জ্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে;
সেই ঝড়ে
ধূলায় তাহারা পড়ে;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হ'য়ে
সে বাতাসে কোথা যায় ব'য়ে?
হে রুদ্র আমার,
মার্জ্জনা তোমার
গর্জ্জমান বজ্রাগ্নি-শিখায়,
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

(১২ই পৌষ, ১৩২১) —বলাকা।

———

প্রতীক্ষা

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
গেলো দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
সুখে দুঃখে উঠে নেবে
বাড়ায়েছি হাত
দিন রাত ;
কেবল ভেবেছি, দেবে, দেবে,
আরো কিছু দেবে।

দিলে, তুমি দিলে, শুধু দিলে ;
কভু পলে পলে তিলে তিলে,
কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
দানের শ্রাবণে।
নিয়েছি ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়ায়ে,
হাতে পায়ে রেখেছি জড়ায়ে
জালের মতন ;
দানের রতন
লাগিয়েছি ধূলার খেলায়
অযত্নে হেলায়,
আলস্যের ভরে
ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে।
তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে,
তোমার দানের পাত্র নিত্য ভ'রে উঠিছে নিখিলে।

অজস্র তোমার
সে নিত্য দানের ভার
আজি আর
পারি না বহিতে।
পারি না সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা,
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়॥

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পূরাইবে কবে?
শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
ধূলায় ফেলিয়া টানি',—
সারা রাত্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় প'রে
লবে মোরে লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হ'তে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্ম্মল আলোতে।

দুই নারী

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিলো দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।
একজনা—উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা—লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি',
দু'হাতে ছড়ায় তা'রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থ-তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

(২০শে মাঘ, ১৩২১) —বলাকা।

মূল

আগা বলে—আমি বড়ো, তুমি ছোটো লোক।
গোড়া হেসে বলে—ভাই, ভালো তাই হোক্।
তুমি উচ্চে আছ ব'লে গর্ব্বে আছ ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব্ব মোর॥

(*১৩০৬) —কণিকা।

প্রতিদান

পাখীরে দিয়েছো গান, গায় সেই গান,
তা'র বেশী করে না সে দান।
আমারে দিয়েছো স্বর, আমি তা'র বেশী করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে ক'রেছো স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধন-বিহীন।
আমারে দিয়েছো যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তা'রে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি;
সুখস্বপ্ন-রসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি'।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তা'রে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ'করিয়া তা'রে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিন-শেষে মিলনের রাতে।

তুমি তো গড়েছো শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছো আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছো আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।
আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও!
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হ'তে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তা'র বেশী ফিরে তুমি পাও।

(২৪শে মাঘ, ১৩২১) —বলাকা।

আদিরহস্য

বাঁশী বলে, মোর কিছু নাহিকো গৌরব,
কেবল ফুঁয়ের জোরে মোর কলরব।
ফুঁ কহিল, আমি ফাঁকি, শুধু হাওয়াখানি,—
যে জন বাজায় তা'রে কেহ নাহি জানি।

(*১৩০৬) —কণিকা।

বলাকা

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'লো,—যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এলো তা'র ভেসে-আসা তারা-ফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতট-তলে
দেওদার স্তব্ধ সারে সারে ;
মনে হ'লো সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেলো দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিলো আকাশে।

ঐ পক্ষ-ধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেলো চলি' স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিলো শিহরি'
গিরি-শ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হ'লো এ পাখার বাণী
দিলো আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিলো হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি',
হে পাখা বিবাগী!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।"
হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়!
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে!
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

(কার্ত্তিক, ১৩২২) —বলাকা।

যৌবন

যৌবন রে, তুই কি র'বি সুখের খাঁচাতে?
তুই যে পারিস্ কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে
পুচ্ছ নাচাতে।
তুই পথহীন সাগর-পারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে যেন কেড়ে
তোর যে দাবী-দাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারী?
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারী।
মৃত্যু যে তা'র পাত্রে বহন করে
অমৃত-রস নিত্য তোমার তরে;
ব'সে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোম্‌টা টানি'।
সেই আবরণ দেখ্ রে উতারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি।

যৌবন রে, রয়েছো কোন্ তানের সাধনে?
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে?

তোমার বাণী দখিন্ হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপ্‌নাকে তা'র চিনায়,
তোমার বাণী জাগে প্রলয়-মেঘে
ঝড়ের ঝঙ্কারে ;
ঢেউয়ের পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয়-ডঙ্কা রে ॥

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডীতে ?
বয়সের এই মায়া-জালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।
খড়্গসম তোমার দীপ্ত দারুণ শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা,
জীর্ণতারি বক্ষ দু-ফাঁক ক'রে
অমর পুষ্প তব
আলোক পানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য-নব ॥

যৌবন রে, তুই কি হ'বি ধূলায় লুণ্ঠিত ?
আবর্জ্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানি-ভারে
রইবি কুণ্ঠিত ?
প্রভাত যে তা'র সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যূষে দেয় আনি',
আগুন আছে ঊর্দ্ধশিখা জ্বেলে
তোমার সে যে কবি।
সূর্য্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

(৪ঠা চৈত্র, ১৩২২) —বলাকা।

নববর্ষ

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী ;
তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথ-হারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণিপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়-শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার—
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার ;
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিক্‌-হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেলো, ওরে যাত্রী।
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পাত্র চূর।
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তা'রে জানি,
ধরো তা'র পাণি ;—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তা'র দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী,
গেছে কেটে, যাক্‌ কেটে পুরাতন রাত্রি।

(৯ই বৈশাখ, ১৩২৩) —বলাকা।

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিওরের ঐ জান্‌লা দুটো,—গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে;
বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ;
কত রকম কবিরাজী, কতই মুষ্টিযোগ,
একটু মাত্র অসাবধানেই, বিষম কর্ম্মভোগ।
এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোম্‌টা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমায় ব'ল্‌লে লক্ষ্মী সতী,
ভালো মানুষ অতি!

এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে,
তা'র পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাব্‌বো এমন সময় ছিলো কোথা!

এই জীবনটা ভালো, কিম্বা মন্দ, কিম্বা যা-হোক-একটা-কিছু,
সে কথাটা বুঝ্‌বো কখন্, দেখ্‌বো কখন্, ভেবে আগু-পিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চ'ল্‌ছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা!
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে সেই চাকাটা—ঐ যে থাম্‌লো যেন;
থামুক তবে! আবার ওষুধ কেন?

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিলো বনের আঙিনায়।
গন্ধে বিভোল দক্ষিণ-বায়
দিয়েছিলো জলস্থলের মর্ম্ম-দোলায় দোল,
হেঁকেছিলো, "খোল্ রে দুয়ার খোল্।"
সে যে কখন্ আস্‌তো যেতো জান্‌তে পেতেম না যে।
হয় তো মনের মাঝে
সঙ্গোপনে দিতো নাড়া; হয় তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাতো; হয় তো বাজ্‌তো বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা; কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে

হয় তো পরাণ রইতো চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে,
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আস্‌তে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যা-বেলায়
পাড়ায় কোথা সতরঞ্চ খেলায়।
থাক্ সে কথা!
আজ্‌কে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা?

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল 'এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠ্‌ছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রা-বিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'তো সন্ধ্যা-তারা ওঠা,
মিথ্যা হ'তো কাননে ফুল-ফোটা।
বাইশ বছর ধ'রে
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তা'র তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাট্‌তো আরো বাঁচ্‌লে পরে।
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী ব'লে করে আমার খ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা।'
আজ্‌কে কখন মোর
কাট্‌লো বাঁধন-ডোর

জনম মরণ এক হয়েছে ঐ যে অকূল বিরাট্ মোহানায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশী বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধূলায় প'ড়ে থাক্!
মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় ক'র্‌বে না সে কভু!
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইলো নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুব মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী;
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হ'তে পার ক'রে দাও কালের পারাবার।

(প্র—১৩২৪) —পলাতকা।

———

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধ'র্‌লো তা'রে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হ'লো বড়ো;
নানা ছাপের জম্‌লো শিশি, নানা মাপের কৌটো হ'লো জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে ক'র্‌লে যখন অস্থি জরজর
তখন ব'ল্‌লে, "হাওয়া বদল করো।"
এই সুযোগে বিনু এবার চাপ্‌লো প্রথম রেলের গাড়ী,
বিয়ের পরে ছাড়্‌লো প্রথম শ্বশুরবাড়ী।

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আব্‌ডালে
মোদের হ'তো দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে;
মিলন ছিলো ছাড়া ছাড়া,
চাপা হাসি টুক্‌রো কথার নানান্‌ জোড়াতাড়া।
আজ্‌কে হঠাৎ ধরিত্রী তা'র আকাশ-ভরা সকল আলো ধ'রে
বর-বধূরে নিলে বরণ ক'রে।
রোগা মুখের মস্ত বড়ো দু'টি চোখে
বিনুর যেন নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি হ'লো নতুন লোকে।

রেল-লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্‌সো খুলে
টাকা শিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হ'লে পরে
আনন্দ তা'র আপ্‌নারি ভার বইবে কেমন ক'রে?
সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার হ'তে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে,—
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভ'র্‌তে হবে সে যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগ্‌ছে বারেবার
নিখিলে আজ এক্‌লা শুধু আমিই কেবল তা'র ;
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাসুর সাম্‌নে পিছে ডাইনে বাঁয়ে ;
সেই কথাটা মনে ক'রে পুলক দিল গায়ে।

বিলাসপুরের ইষ্টেশনে বদল হবে গাড়ী ;
তাড়াতাড়ি
নাম্‌তে হ'লো, ছ' ঘণ্টা কাল থাম্‌তে হবে যাত্রী-শালায়,
মনে হ'লো এ এক বিষম বালাই
বিনু ব'ল্‌লে, "কেন, এই তো বেশ!"
তা'র মনে আজ নেই যে খুশীর শেষ!

পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তা'রে যে আজ করেছে চঞ্চলা,—
আনন্দে তাই এক হ'লো তা'র পৌঁছনো আর চলা।
যাত্রী-শালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,—
"দেখো, দেখো, এক্কাগাড়ী কেমন চলে!
আর দেখেছো বাছুরটি ঐ, আ ম'রে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ!
ঐ যেখানে দীঘির উঁচু পাড়ি,—
সিসুগাছের তলাটিতে, পাঁচিল-ঘেরা ছোট্টো বাড়ী
ঐ যে রেলের কাছে,—
ইষ্টেশনের বাবু থাকে?—আহা ওরা কেমন সুখে আছে!"

যাত্রী-ঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে,
ব'লে দিলেম, "বিনু এবার চুপ্‌টি ক'রে ঘুমোও আরামেতে।"
প্ল্যাট্‌ফরমে চেয়ার টেনে
প'ড়্‌তে শুরু ক'রে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেলো কত মালের গাড়ী, গেলো প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হ'য়ে গেলো পার।
এমন সময় যাত্রী-ঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হ'য়ে ব'ল্‌লে বিনু—"কথা একটা আছে।"
ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানী মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম ক'রে বাহির হ'য়ে রইলো ধ'রে বারান্দাটার থাম।
বিনু ব'ল্‌লে, "রুক্‌মিনী ওর নাম।
ঐ যে হেথায় কুয়োর ধারে সার-বাঁধা ঘরগুলি
ঐখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি।

তেরো-শো কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হ'লো,—স্বামী স্ত্রী দুই জনে
পালিয়ে এলো জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে
কী-এক নদীর ধারে—"
বাধা দিয়ে আমি ব'ল্লেম হেসে
"রুক্মিনীর এই জীবনচরিত শেষ না হ'তেই গাড়ী প'ড়্বে এসে
আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো
অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো।"
বাঁকিয়ে ভুরু, পাকিয়ে চক্ষু, বিনু ব'ল্লে ক্ষেপে—
"কখ্খনো না, ব'ল্বো না সংক্ষেপে।
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাব্না কিসের তবে?
আগাগোড়া সব শুন্তেই হবে।"
নভেল-পড়া-নেশাটুকু কোথায় গেলো মিশে।
রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামী।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পৈঁচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই;
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি;
সে ভাবনাটা ভারী
রুক্মিনীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার পরে ভার
কুলি-নারীর ভাব্না ঘোচাবার।

আজ্‌কে গাড়ী-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে !

অবাক্ কাণ্ড এ কী !
এমন কথা মানুষ শুনেছে কি ?
জাতে হয় তো মেথর হবে, কিম্বা নেহাৎ ওঁছা,
যাত্রী-ঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তা'কে !
এমন হ'লে দেউলে হ'তে ক-দিন বাকি থাকে ?
"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে ! আমি দেখ্‌ছি মোট
একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই !"
বিনু ব'ল্‌লে, "এই
ইষ্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেবো তবে"
এই ব'লে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,-
আচ্ছা ক'রেই দিলেম তা'রে হেঁকে,—
"কেমন তোমার নোক্‌রি থাকে দেখ্‌বো আমি !
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও ! ঘোচাবো নষ্টামি !"
কেঁদে যখন প'ড়্‌লো পায়ে ধ'রে
ত্ব'টাকা তা'র হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় ক'রে।

জীবন-দেউল আঁধার ক'রে নিব্‌লো হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম ত্ব'মাস যেই ফুরালো।

বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি',
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিন্নু আমায় ব'লেছিলো, "এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি'
শেষ দু'টি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের পরে নিত্য-সিঁদূর সম।
এই দু'টি মাস সুধায় দিলে ভ'রে
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ ক'রে।"
ওগো অন্তর্যামী,
বিন্নুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই দু'মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি,
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুক্‌মিনীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভ'র্‌বে না সেই ফাঁকা!
বিন্নু যে সেই দু'মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে,
জান্‌লো না তো ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারি হাতে।

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে
"রুক্‌মিনী সে কোথায় আছে?"
প্রশ্ন শুনে অবাক্ মানে,—
রুক্‌মিনী কে তাই বা ক-জন জানে?
অনেক ভেবে "ঝাম্‌রু কুলির বউ" ব'ল্‌লেম যেই,
ব'ল্‌লে সবে, "এখন তা'রা এখানে কেউ নেই।"
শুধাই আমি, "কোথায় পাবো তা'কে?"
ইষ্টেশনের বড়ো বাবু রেগে বলেন, "সে খবর কে রাখে?"

টিকিট-বাবু ব'ল্‌লে হেসে, "তা'রা মাসেক আগে
গেছে চ'লে দার্জ্জিলিঙে কিম্বা খস্‌রুবাগে,
কিম্বা আরাকানে।"
শুধাই যতো, "ঠিকানা তা'র কেউ কি জানে?"—
তা'রা কেবল বিরক্ত হয়, তা'র ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ!
কেমন ক'রে বোঝাই আমি—ওগো আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তা'রে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন;
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
"এই দু'টি মাস সুধায় দিলে ভ'রে"
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইবো কেমন ক'রে?
র'য়ে গেলেম দায়ী
মিথ্যা আমার হ'লো চিরস্থায়ী।

(১৩২৬) —পলাতকা।

নূতন ও সনাতন

রাজা ভাবে নব নব আইনের ছলে
ন্যায় সৃষ্টি করি আমি।—ন্যায় ধর্ম্ম বলে—
আমি পুরাতন, মোরে জন্ম কেবা দেয়।
যা তব নূতন সৃষ্টি সে শুধু অন্যায়।

(*১৩০৬) —কণিকা।

নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয়, "মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে,
ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে?—বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুণো সে বড়ো;—
তাঁকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘ'ট্‌তে দেবো নাকো।"
বাপ ব'ল্‌লে, "কান্না তোমার রাখো;
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জানো না কি মস্ত কুলীন ও যে!
সমাজে তো উঠ্‌তে হবে সেটা কি কেউ ভাবো?
ওকে ছাড়্‌লে পাত্র কোথায় পাবো?"

মা ব'ল্‌লে, "কেন ঐ যে চাটুজ্জেদের পুলিন,
নাই বা হ'লো কুলীন,—
দেখ্‌তে যেমন তেম্‌নি স্বভাবখানি,
পাস ক'রে ফের পেয়েছে জলপানি,
সোনার টুক্‌রো ছেলে।
এক-পাড়াতে থাকে ওরা—ওরি সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হ'লো; ওকে যদি বলি আমি আজই
এখখনি হয় রাজি।"

বাপ ব'ল্‌লে, "থামো,
আরে আরে রামোঃ।'
ওরা আছে সমাজের সব তলায়।
বামুন কি হয় পৈতে দিলেই গলায়?
দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালো হ'লেই পাত্র হ'লো? রাধে।
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে?"

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখ্‌লে ক'নের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হ'লো রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তা'র কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চ'ল্‌তে খেতে শুতে
ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হান্‌ছে যেন বেদনা-বিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব্ব বাপের মনে জাগে,—
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে
ধর্ম্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্ব্বল্য।
তাঁর জীবনের রথের চাকা চ'ল্‌লো
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চিখানেক এদিক-ওদিক একটু হবার জো নেই
তিনি বলেন, তাঁর সাধনা বড়োই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর,
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য,
মেয়েমানুষ বুঝ্‌বে না তা'র মূল্য।

অন্তঃশীলা অশ্রু-নদীর নীরব নীরে
দু'টি নারীর দিন ব'য়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হ'লো পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়-বেলায় মেয়েকে বাপ ব'লে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি'
"হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি।"

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্ব্বাদের প্রথম অংশ দু'মাস যেতেই ফ'ল্‌লো কেমন ক'রে—
পঞ্চাননকে ধ'র্‌লো এসে যমে;
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফ'ল্‌লো না তা'র শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে,
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এলো সিঁদুর মুছে শিরে।

দুঃখে সুখে দিন হ'য়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝ'রে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো,
অবশেষে হ'লো
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।
কখন্ শিশুকালে
হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিলো একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্য-তল ফুঁড়ি';
জান্‌তো না তো আপ্‌নাকে সে,
শুধায়নি তা'র নাম কোনোদিন বাহির হ'তে ক্ষেপা বাতাস এসে,
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তা'র উঠ্‌ছে ফুটে
মধুর রসে ভ'রে উঠে।

সে যে প্রেমের ফুল
আপন রাঙা পাপ্‌ড়ী-ভারে আপ্‌নি সমাকুল।
আপ্‌নাকে তা'র চিন্‌তে যে আর নাইকো বাকি,
তাই তো থাকি' থাকি'
চ'ম্‌কে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশ-পারের বাণী তা'রে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝর্‌ণা বেয়ে
রাতের অন্ধকারে
কোন্‌ অসীমের রোদন-ভরা বেদন লাগে তা'রে।
বাহির হ'তে তা'র
ঘুচে গেছে সকল অলঙ্কার ;
অন্তর তা'র রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে,
তাই দেখে সে আপ্‌নি ভেবে মরে।
কখন্‌ কাজের ফাঁকে
জান্‌লা ধ'রে চুপ্‌ ক'রে সে বাইরে চেয়ে থাকে—
যেখানে ঐ সজ্‌নে-গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবসরাতি।
যে ছিলো তা'র ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথী
আজ সে কেমন ক'রে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিলো ভ'রে।
অরূপ হ'য়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে।
পায়ের শব্দ তারি
মর্ম্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি'।

কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুন্‌গুনানি।

মেয়ের নীরব মুখে
কী দেখে মা, শেল বাজে তা'র বুকে।
না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া;
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিলে অধরে তা'র শরৎ-নিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে নাকো—
কেঁদে বলে, "হায় ভগবান্, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাকো?

একদা বাপ দুপুর বেলায় ভোজন সাঙ্গ ক'রে
গুড়গুড়িটার নলটা মুখে ধ'রে,
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
প'ড়তেছিলেন ইংরেজী এক প্রেমের উপন্যাস।
মা ব'ল্লেন, বাতাস ক'রে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
"যার খুশী সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ'রে
আমি কিন্তু পারি যেমন ক'রে
মঞ্জুলিকার দেবোই দেবো বিয়ে।"
বাপ ব'ল্লেন, কঠিন হেসে, "তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে ক'রো আমার মরার পরে,
সেই ক'টা দিন থাকো ধৈর্য্য ধ'রে।"

এই ব'লে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা ব'ল্‌লেন, "উঃ কী পাষাণ প্রাণ,
স্নেহ মায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে ?"
বাপ ব'ল্‌লেন, "আমি পাষাণ বটে।
ধর্ম্মের পথ কঠিন বড়ো, ননীর পুতুল হ'লে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গ'লে।"

মা ব'ল্‌লেন, "হায় রে কপাল! বোঝাবোই বা কারে!
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে ম'র্‌বে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ঐ মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুক্‌নো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ,
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান্।"

বাপ একটু হাস্‌লো কেবল, ভাব্‌লে, "মেয়েমানুষ
হৃদয়-তাপের ভাপে-ভরা ফানুস্।
জীবন একটা কঠিন সাধন—নেই সে ওদের জ্ঞান।"
এই ব'লে ফের চ'ল্‌লো পড়া ইংরেজী সেই প্রেমের উপাখ্যান।

দুখের তাপে জ্ব'লে জ্ব'লে অবশেষে নিব্‌লো মায়ের তাপ;
সংসারেতে একা প'ড়্‌লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তা'র স্ত্রী-পুত্রদের সাথে
বিদেশে পাট্‌নাতে।

দুই মেয়ে তা'র কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ী আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্ বিন্ধ্যগিরির পার।
প'ড়্লো মঞ্জুলিকার পরে বাপের সেবা-ভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হ'তো না তাঁর রুচি।
সকাল-বেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুটি কিম্বা লুচি;
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হ'তো পাঁচটা ছ'টা;
পাঁঠা হ'তো রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দু'বেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তা'র সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ্দ এই।
বাপের ঘরটি আপ্নি মোছে ঝাড়ে
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপ্নি তোলে পাড়ে।
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ীর ফর্দ্দ টুকে রাখে।
গয়লানী আর মুদির হিসাব রাখ্তে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হ'লে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসুন্দি তা'র কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তা'র কত

নালিশ শুন্‌তে হয়।
তা ছাড়া তা'র পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদে পদেই ঘটে যে তা'র ত্রুটি।
মোটামুটি—
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।
হ'য়ে নীরব নত,
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্ব্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।
যেমন ক'রে মাতা বারম্বার
শিশু ছেলের সহস্র আব্‌দার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেম্‌নি ক'রেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলী তা'র বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।
বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান্
সেই কথাটা মনে ক'রে গর্ব্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ।
"আমার মায়ের যত্ন যে জন পেয়েছে একবার
আর কিছু কি পছন্দ হয় তা'র ?"

হোলির সময় বাপকে সে-বার বাতে ধ'র্‌লো ভারি।
পাড়ায় পুলি ক'র্‌ছিলো ডাক্তারি,
ডাক্‌তে হ'লো তা'রে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হ'তে পারে
ছিলো এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আস্‌তে যেতে হয়।

মঞ্জুলী তা'র সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো।
এমন বিপদ্ কারো
হয় কি কোনো দিন ?
গলাটি তা'র কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুন্‌তে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তা'র বাজে রিনিরিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তা'র বুকে
দিবারাত্রি ট'ল্‌ছে কেন এমনতর ধরা-পড়ার মুখে ?

ব্যামো সেরে আস্‌ছে ক্রমে,
গাঁঠের ব্যথা অনেক এলো ক'মে।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরাণখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে যেয়ে
চুপ্ ক'রে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগী-সেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—
"জানো তুমি, তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে।

সে ইচ্ছাটি তাঁরি
পূরাতে চাই যেমন ক'রেই পারি।
এমন ক'রে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি!"
"না, না, ছিছি, ছিছি!"
এই ব'লে সে মঞ্জুলিকা ছু'হাত দিয়ে মুখখানি তা'র ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে ছুয়ার দিয়ে প'ড়্‌লো মেঝের পরে—
ঝর্‌ঝরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে বুক ফেটে তা'র অশ্রু ঝ'রে পড়ে।
ভাব্‌লে, "পোড়া মনের কথা এড়ায়নি ওঁর চোখ!
আর কেন গো! এবার মরণ হোক।"

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগ্‌লো দ্বিগুণ ক'রে
অষ্টপ্রহর ধ'রে।
আবশ্যকটা সারা হ'লে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে,
যে বাসনটা মাজা হ'লো আবার সেটা মাজে।
ছু'তিন ঘণ্টা পর
একবার যে ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন্ যে স্নান, কখন যে তা'র আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।
কাজের কামাই ছিল নাকো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়।
শ্রান্ত হ'য়ে আপ্‌নি ঘুমে মেঝের পরে লোটায়।
যে দেখ্‌লে সে-ই অবাক হ'য়ে রইলো চেয়ে,
ব'ল্‌লে "ধন্যি মেয়ে!"

বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, "গর্ব্ব করিনেকো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর। নইলে দেখ্‌তে অন্যরকম হ'তো।
আজকালকার দিনে
সংযমেরি কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখ্‌ছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।"

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবে মাত্র এগারো মাস হবে,
গুজব গেল শোনা
এই বাড়ীতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে মঞ্জুলিকার হয়নিকো বিশ্বাস,
তা'র পরে সব রকম দেখে ছাড়্‌লে সে নিঃশ্বাস।
ব্যস্ত সবাই, কেমনতর ভাব,
আস্‌ছে ঘরে নানারকম বিলিতি আস্‌বাব।
দেখ্‌লে বাপের নতুন ক'রে সাজসজ্জা সুরু,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু,
পাকাচুল সব কখন্ হ'লো কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা।

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার প'ড়্‌লো মনে
বুকভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হোক্ না মৃত্যু, তবু
এ বাড়ীর এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু।

কল্যাণী সেই মূর্ত্তিখানি সুধামাখা
এ সংসারের মর্ম্মে ছিল আঁকা ;
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিলো ঘরের মাঝে,
তাঁরি পরশ ছিলো সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে প'ড়্লো প্রাণ।

ছেড়ে লজ্জা ভয়
কন্যা তখন নিঃসঙ্কোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,—
"তুমি নাকি ক'র্তে যাবে বিয়ে ?
আমরা তোমার ছেলে মেয়ে নাত্‌নী নাতী যত
সবার মাথা ক'র্বে নত ?
মায়ের কথা ভুল্‌বে তবে ?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে ?"

বাবা ব'ল্‌লে শুষ্ক হাসে,
"কঠিন আমি কেই-বা জানে না সে ?
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম্ম
স্ত্রী না হ'লে অপূর্ণ যে রয়
মনু হ'তে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্ম্মপথে হাঁটা
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দুঃখ নিতে দুঃখ দিতে
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে ?"

বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের ক'দিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি প'ড়ে
পুলিন তা'কে বিয়ে ক'রে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চ'লে,
সেইখানেতেই ঘর পাত্‌বে ব'লে।
আগুন হ'য়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

(প্র—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) —পলাতকা।

কৃতীর প্রমাদ

টিকি মুণ্ডে চড়ি' উঠি' কহে ডগা নাড়ি'—
হাত পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি।
হাত পা কহিল হাসি' হে অভ্রান্ত চুল,
কাজ করি, আমরা যে তাই করি ভুল।

(*১৩০৬) —কণিকা

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্টো আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুন্‌তে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিলো সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চ'ল্‌ছিলো সাবধানী।

আমি ছিলাম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখ্‌তে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তা'র নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তা'রে, "কী হয়েছে বামি?"
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হ'লো আকাশ-পানে চেয়ে
আমার বামীর মতোই যেন অম্‌নি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপ-শিখাটি বাঁচিয়ে একা চ'ল্‌ছে ধীরে ধীরে।
নিব্‌তো যদি আলো, যদি হঠাৎ যেতো থামি',
আকাশ ভ'রে উঠ্‌তো কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি॥"

(১৩২৪) —পলাতকা।

শিশু ভোলানাথ

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি' দুই হাত
যেখানে করিস্ পদ-পাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যায় সব ;
আপন বিভব
আপনি করিস্ নষ্ট হেলা-ভরে ;
প্রলয়ের ঘূর্ণা-চক্র-পুরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে ;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হ'তে ধ্বংস-মাঝে মুক্তি দিস্ অনর্গল,
খেলারে করিস্ রক্ষা ছিন্ন করি' খেলেনা-শৃঙ্খল।
অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরি তো কোনো মূল্য নাই,
রচিস্—যা তোর ইচ্ছা তাই
যাহা খুশী তাই দিয়ে,
তার পর ভুলে যাস্ যাহা ইচ্ছা তাই নিয়ে।
আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে, দিগম্বর,
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধূলি-পর।
লজ্জা-হীন সজ্জা-হীন বিত্ত-হীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি'।

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি';
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্ত্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে॥

(প্র—মাঘ, ১৩২৮) —শিশু ভোলানাথ।

প্রশ্নের অতীত

হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা ?
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর ?
হিমালয় কহিল মোর চিত্ত নিরুত্তর।

(*১৩০৬) —কণিকা।

মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন্ খেল্‌তে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুন্‌গুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইতো, আমার
দোল্‌না ঠেলে ঠেলে ;
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলি-বনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে ?

কবে বুঝি আন্‌তো মা সেই
ফুলের সাজি ব'য়ে,
পূজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হ'য়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার্ ঘরের কোণে ;
জান্‌লা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের পরে ধ'রে কবে
দেখ্‌তো আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।

(৯ই আশ্বিন, ১৩২৮) —শিশু ভোলানাথ

বাণী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হ'তিস্,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায়
হ'তো কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কত রকম নাচন দিয়ে
আমায় যেতো ডেকে।
"মা" ব'লে তা'র সাড়া দেবো
কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার
নেচে উঠ্‌তো তাই।
তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায়
আমার কানে কানে
টল্‌মলিয়ে কী ব'ল্‌তো যে
ঝল্‌মলানির গানে।
আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম
আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তা'রা
নাচন দিতো জুড়ি'।

উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর
কোথায় থেকে এসে
আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে
কোথায় যেতো ভেসে।
সেই হ'তো তোর বাদল বেলার
রূপকথাটির মতো ;
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায়
পেরিয়ে রাজ্য কত ;
সেই আমারে ব'লে যেতো
কোথায় আলেখ-লতা,
সাগর-পারের দৈত্য-পুরের
রাজকন্যার কথা ;
দেখ্‌তে পেতেম দুয়োরাণীর
চক্ষু ভরো-ভরো,
শিউরে উঠে পাতা আমার
কাঁপ্‌তো থরোথরো।
হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার
হাওয়ার পাছে পাছে
নাম্‌তো আমার পাতায় পাতায়
টাপুর-টুপুর নাচে ;
সেই হ'তো তোর কাঁদন সুরে
রামায়ণের পড়া,
সেই হ'তো তোর গুনগুনিয়ে
শ্রাবণ-দিনের ছড়া।

মা, তুই হ'তিস্ নীলবরণী,
আমি সবুজ কাঁচা ;
তোর হ'তো, মা, আলোর হাসি,
আমার পাতার নাচা।
তোর হ'তো, মা, উপর থেকে
নয়ন মেলে চাওয়া,
আমার হ'তো আঁকুবাঁকু
হাত তুলে গান গাওয়া।
তোর হ'তো, মা, চিরকালের
তারার মণিমালা,
আমার হ'তো দিনে দিনে
ফুল-ফোটাবার পালা।

(প্র—চৈত্র, ১৩২৮) —শিশু ভোলানাথ।

উপলক্ষ্য

কাল বলে, আমি সৃষ্টি করি এই ভব।
ঘড়ি বলে, তা হ'লে আমিও স্রষ্টা তব।

(*১৩০৬) —কণিকা

চিরন্তন

যখন প'ড়্‌বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইবো না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেবো বেচা-কেনা,
মিটিয়ে দেবো লেনা-দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে ;
আমায় তখন নাই বা মনে রাখ্‌লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে ॥

যখন জ'ম্‌বে ধূলা তানপূরাটার তারগুলায়—
কাঁটালতা উঠ্‌বে ঘরের দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান, ঘন ঘাসের
প'র্‌বে সজ্জা বনবাসের,
শ্যাওলা এসে ঘির্‌বে দীঘির ধারগুলায়,
আমায় তখন নাই বা মনে রাখ্‌লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে ॥

তখন এম্‌নি ক'রেই বাজ্‌বে বাঁশী এই নাটে,
কাট্‌বে গো দিন যেমন আজো দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী
এম্‌নি সেদিন উঠ্‌বে ভরি',
চ'র্‌বে গোরু, খেল্‌বে রাখাল ঐ মাঠে।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখ্‌লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে॥

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় ক'র্‌বে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাক্‌বে মোরে
বাঁধ্‌বে নতুন বাহুর ডোরে,
আস্‌বো যাবো চিরদিনের সেই-আমি।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখ্‌লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে॥

(*১৩২৩) —প্রবাহিণী।

বাঁধন-হারা

আমারে বাঁধ্‌বি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে ?
আমি যে বন্দী হ'তে সন্ধি করি সবার কাছে ॥
সন্ধ্যা আকাশ বিনা ডোরে বাঁধ্‌লো মোরে গো ;
নিশিদিন বন্ধ-হারা নদীর ধারা আমায় যাচে ॥
যে-কুসুম আপ্‌নি ফোটে আপ্‌নি ঝরে রয় না ঘরে গো
তারা যে সঙ্গী আমার বন্ধু আমার চায় না পাছে ॥
আমারে ধ'র্‌বি ব'লে মিথ্যে সাধা ;
আমি যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা।
আপ্‌নি যাহার প্রাণ দুলিল মন ভুলিল গো,
সে মানুষ আগুন-ভরা, প'ড়্‌লে ধরা সে কি বাঁচে ?
সে যে ভাই হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথী, দিবারাতি গো
কেবলি এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার রক্ত নাচে ॥

(*১৩২৩) —প্রবাহিণী।

মাটির প্রদীপ

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যা-তারা তাকায় তারি আলো দেখ্‌বে ব'লে ॥
সেই আলোটি নিমেষ-হত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে
শ্যামল ধরার হৃদয়-তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায় ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নাম্‌লো সন্ধ্যা-তারার বাণী
আকাশ হ'তে আশীষ আনি',
অমর শিখা আকুল হ'লো মর্ত্ত্য শিখায় উঠ্‌তে জ্ব'লে ॥

(*১৩২৫) —প্রবাহিণী।

পাগল

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।
বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥
আমি যে তোর আলোর ছেলে,
আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে ;
মুখ লুকালি, মরি আমি সেই খেদে,
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥

অন্ধকারে অস্ত-রবির লিপি লেখা,
আমারে তা'র অর্থ শেখা।
তোর প্রাণের বাঁশীর তান সে নানা,
সেই আমারই ছিল জানা,
আজ মরণ বীণার অজানা সুর নেবো সেধে ;
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥

(আষাঢ়, ১৩৩০) —প্রবাহিণী।

মিলন

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে ॥
বনের ছায়ায় জল ছলছল সুরে,
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
খনে খনে ঐ গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্ বাজে ॥

কোন্ দূরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তা'র বিরহ ব্যথার মালা,
গোপন মিলন-অমৃত-গন্ধ ঢালা;
মনে হয় তা'র চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তা'র অজানা জনের সাজে ॥

(*১৩২৫) —প্রবাহিণী।

নব জাগরণ

রজনীর শেষ তারা, গোপনে আঁধারে আধোঘুমে
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুসুমে ॥
সেই মতো যিনি এই জীবনের আনন্দরূপিণী
শেষ ক্ষণে দেন যেন তিনি
নব জীবনের মুখ চুমে।
এই নিশীথের স্বপ্নরাজি
নব জাগরণ-ক্ষণে নব গানে উঠে যেন বাজি'।
বিরহিণী যে ছিল রে মোর হৃদয়ের মর্ম্ম-মাঝে
বধূবেশে সেই যেন সাজে
নব দিনের চন্দনে কুঙ্কুমে ॥

(*১৩২৮) —প্রবাহিণী।

সাবিত্রী

ঘন অশ্রু-বাষ্পে ভরা মেঘের দুর্য্যোগে খড়্গ হানি'
ফেলো, ফেলো টুটি'।
হে সূর্য্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনক পদ্মখানি
দেখা দিক ফুটি'।
বহ্নি-বীণা বক্ষে ল'য়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বীণা
সে পদ্মের কেন্দ্র মাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্ম-কালে
প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি'
আমার কপালে॥

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ
উচ্ছ্বসি' উঠিল মন্দ্রি' বারম্বার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সঙ্গীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বন-মন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত॥

তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি
তারে নমোনমঃ।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি' তমঃ,
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি'
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি'
জীবন হিল্লোল॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী ;
আয়ুঃস্রোত মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে,—কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিলো বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশির-চ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ॥

তেজের ভাণ্ডার হ'তে কী আমাতে দিয়েছো যে ভ'রে
কেই বা সে জানে ?
কী জাল হ'তেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণভোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে ?

তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা ;
মুহূর্ত্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় স'রে।
তেমনি সহজ হোক্ হাসি কান্না, ভাবনা বেদনা
না বাঁধুক্ মোরে ॥

তা'রা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ বর্ষণে ;
যোগ দিক্ নির্ঝরের মঞ্জরী-গুঞ্জন-কলরবে
উপল ঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরা-মত্ত বৈশাখের তাণ্ডব লীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তা'র পরে যেন তা'রা সর্ব্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে ॥

হে রবি, প্রাঙ্গনে তব শরতের সোনার বাঁশীতে
জাগিল মূর্চ্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিনী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূণ্য-পথে হ'য়ে বিবাগিনী,
ল'য়ে তা'র ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙ্গালী ?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তা'র বেলা হ'লো শেষ
বুকে লও তা'রে।
শান্তি অভিষেক হোক্, ধৌত হোক্ সকল আবেশ
অগ্নি-উৎস-ধারে।
সীমন্তে গোধূলি লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তা'র স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সঙ্গীত-ধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

(১০ই আশ্বিন, ১৩৩১) —পূরবী

ঈর্ষার সন্দেহ

লেজ নড়ে, ছায়া তা'রি নড়িছে মুকুরে,
কোনোমতে সেটা সহ্য করে না কুকুরে,
গাছ যদি ন'ড়ে ওঠে, জলে ওঠে ঢেউ,
কুকুর বিষম রাগে করে ঘেউ ঘেউ।
সে নিশ্চয় বুঝিয়াছে ত্রিভুবন দোলে
ঝাঁপ দিয়া উঠিবারে তা'রি প্রভুকোলে।
মনিবের পাতে ঝোল খাবে চুকুচুকু,
বিশ্বে শুধু নড়িবেক তা'রি লেজটুকু।

(*১৩০৬) —কণিকা

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তা'রে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি'
চিনেছে আমারে।
তা'রি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে ॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হ'তে মৃত্যুর আঁধারে
চ'লে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্ম-বিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হ'তে অকস্মাৎ করো মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে।
তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
"আছি, আমি আছি" ॥

সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি'
বাঁচি, আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্ব'লে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
নৃত্য-কলরোলে॥

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি' কারে
চ'লে যায় ডাকি'।
অমনি প্রভাত তা'র বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত হস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে॥

কোন্ জ্যোতির্ম্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে॥

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি'
পত্রপুষ্প-ভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি'
রহস্য-সমুদ্র-তল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি॥

তুমি সে আকাশ-ভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত-বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হ'য়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু'বাহু বাড়ালে॥

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে;
মানস-তরঙ্গ-তলে বাণীর সঙ্গীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি',
আপনার মনে,
বাণী-হীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা ব'সে জাগি,
নির্জ্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস॥

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরাণে
চরম আহ্বান?
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সঙ্গীতে?
মহা-নিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা ব'সে র'য়েছো, রমণী,
নীরব নিশীথে?

মহেন্দ্রের বজ্র হ'তে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি',
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কাল-বৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তা'র স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হ'য়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি' করো পরিত্রাণ,
সব লও লুটে॥

তা'র পরে যাও যদি যেয়ো চলি' ; দিগন্ত-অঙ্গন
হ'য়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্ব্বশেষ লাভ,
সর্ব্বশেষ ক্ষতি ;
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ-সুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি ॥

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রা-সহচরী ?
দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চ'লে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্ম্মরি' :
নিকুঞ্জ-ভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চ'লে তা'র স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার ॥

জানি জানি আপনার অন্তরের গহন-বাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতি লগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিণী ?
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র গানে
জাগায়ে দিলে না
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা ॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হ'লো তুলে।
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে?
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি'
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী-ভৈরবী॥

(১৫ই আশ্বিন, ১৩৩১) —পূরবী

নম্রতা

কহিল কঞ্চির বেড়া,—ওগো পিতামহ
বাঁশবন, নুয়ে কেন পড়ো অহরহ?
আমরা তোমারি বংশে ছোটো ছোটো ডাল,
তবু মাথা উঁচু ক'রে থাকি চিরকাল।
বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটোতে বড়োতে,
নত হই, ছোটো নাহি হই কোনোমতে।

(*১৩০৬) —কণিকা।

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চ'লে যাও থাকি' থাকি'।
হৃদয় কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি' দেয় তা'র গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি',
হে কালো কাজল আঁখি॥

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তা'র বেণু;
বলে, এসো, এসো, লও খুঁজে লও মোরে,
মধু-সঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ ক'রে,
এসো এ-বক্ষ মাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে॥

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবন বেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছল-ছলি'
এ-পারে ও-পারে করে কী যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়াছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হের কী আশায় মাতি'
আছে অঞ্জলি পাতি'॥

হের গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণ-পক্ষ প্রসারি' সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হ'তে নাহি জানি ॥

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
এখনো তোমার সময় আসিল না কি ?
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ
পাওনি কি সংবাদ ?
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটেনি কি সে বারতা ?
শোনোনি কী গাহে পাখী ?
হে কালো কাজল আঁখি ॥

শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল,
বেণু-শাখাগুলি খনে খনে টল মল,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেলো ফুল দল
কিছু না রহিল বাকি।
এলো যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি'
হে কালো কাজল আঁখি ॥

(১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) —পূরবী।

অন্ধকার

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুভ্র তব আদি শঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিলো, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি';
সে তব সঙ্কেত মন্ত্র ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান্,
কর্ম্মের তরঙ্গে মোর; স্বপ্ন-উৎস হ'তে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি'॥

নিস্তব্ধের সে আহ্বানে, বাহিয়া জীবন-যাত্রা মম,
—সিন্ধু-গামী তরঙ্গিণী সম—
এত কাল চ'লেছিনু তোমারি সুদূর অভিসারে
বঙ্কিম জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে
অনির্দ্দেশ অলক্ষ্যের পানে।
কভু পথ তরুচ্ছায়ে খেলা-ঘর ক'রেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা
অশেষের টানে॥

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি' দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্ত-রবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হ'লো।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি' তোমার প্রাঙ্গনতলে এসে
বলে "দ্বার খোলো"॥

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাইনি উদ্দেশ,
আজ সে সন্ধান হোক্ শেষ।
হে চির নির্ম্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্ব্বারিত হোক্
আঁধারের আলোক ভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেই-খানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হ'তে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সঙ্গীত তোমার॥

দিনের সংগ্রহ হ'তে আজি কোন্ অর্ঘ্য নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে ভাবি তাই।
কত না শ্রেষ্ঠীর হাতে পেয়েছি কীর্ত্তির পুরস্কার,
সযত্নে এসেছি ব'হে সেই-সব রত্ন অলঙ্কার,
ফিরিয়াছি দেশ হ'তে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হ'লো সারা,
দিনের আলোর সাথে ম্লান হ'য়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে॥

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হ'য়ে যায় মিছে,
সে বোঝা ফেলিয়া যাবো পিছে।
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রা সহচরী
অকারণে দিয়েছিলো মোর হাতে মাধবী-মঞ্জরী,
আজো তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তা'র গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেবো তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে ॥

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হ'তে
পাড়ি দিলো এ ফুল আলোতে।
সুপ্তি হ'তে জেগে দেখি, বসন্তে একদা রাত্রি শেষে
অরুণ কিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হৃদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধূলা এরে কিছুতে পারে না কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিনু তব দ্বারে,
তুমি লও চিনে ॥

হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এলো মিশে,
বুঝেও তখন বুঝিনি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিলো এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিলো তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হ'লো অবসান
আমার ধেয়ান হ'তে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে ॥

(২৬শে পৌষ, ১৩৩১) —পূরবী

দোল-পূর্ণিমা

১

দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা হৃদয় আকাশে,
দোল ফাগুনের চাঁদের আলোর সুধায় মাখা সে।
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে
বচনহারা ধ্যানের পারে
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে ছিলো ঢাকা সে॥
দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেলো গোপন রেণুকা,
গন্ধে তা'রি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে
লাগ্‌লো যে রঙ পূর্ণিমাতে
আমার গানের সুরে সুরে রইলো আঁকা সে॥

২

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিলো তারে বন-বীথি
কোকিলের কল-গীতি,
ভরি দিলো বকুলের গন্ধে॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙায় দিগন্ত।
বাণী মম নিলো তুলি'
পলাশের ফুল-ধূলি,
এঁকে দিলো তোমার সীমন্তে॥

(১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩২)

পাঠ পরিচয়

কিছুদিন আগে, রবীন্দ্রনাথের ২০০টি ভালো কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভোট সংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জন-প্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সংস্করণ চয়নিকা মোটামুটি এই লোক-প্রিয়তা অনুসারে সংকলন করা হইয়াছে। সূচি-পত্রে প্রত্যেকটি কবিতার পাশে তাহার ভোট সংখ্যা উল্লেখ করা হইল। আমরা কিন্তু শুধু ভোট সংখ্যা দিয়া বাছাই করি নাই। প্রত্যেকটি প্রচলিত বই হইতে যাহাতে কিছু কিছু কবিতা থাকে, এবং কোনো বিশেষ সময় বা বিশেষ ধরণের লেখা যাহাতে একেবারে বাদ না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই জন্য ভোট কম পাইয়াছে এমন কোনো কোনো কবিতাও রাখা হইল। আবার একই বই হইতে যাহাতে খুব বেশী কবিতা না যায় এই জন্য ভোট বেশী পাইয়াছে এমন কবিতাও বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্থানাভাবের জন্য খুব দীর্ঘ কবিতাগুলিও রাখা যায় নাই।

এই গ্রন্থে, কণিকার কবিতা ছাড়া অন্য সমস্ত কবিতাগুলি কালক্রমানুসারে সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে একই বইয়ের কবিতা, বিভিন্ন সময়ে লেখা হইলেও, একত্র রাখা হইল। প্রত্যেকটি কবিতার নীচে বইয়ের নাম ও লেখার তারিখ দেওয়া হইয়াছে। এইখানে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় বাঙ্‌লা ১২৬৮ সালে, ২৫শে বৈশাখ তারিখে।

লেখার তারিখ জানা না থাকিলে, যে তারিখে কবিতাটি কোনো সাময়িক কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে "প্রথম প্রকাশের তারিখ" জানাইবার জন্য "প্র—" এই নির্দ্দেশক চিহ্নটি ব্যবহার করা হইল। যেমন, (প্র—চৈত্র, ১৩৩০) মানে বুঝিতে হইবে যে, লেখার তারিখ জানা নাই, তবে কবিতাটি ১৩৩০ সালের চৈত্র মাসে কোনো সাময়িক কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয়।

যেখানে লেখার তারিখ জানা নাই বা বইতে ছাপা হইবার আগে কবিতাটি কোনো কাগজে বাহির হয় নাই এমন জায়গায়, আমাদের মতে কবিতাটি যে সময়ের লেখা, সেই তারিখ একটি (*) চিহ্ন দিয়া উল্লেখ করা হইল। যেমন, (*১৩০৬) মানে বুঝিতে হইবে এই যে, তারিখ ঠিক জানা নাই, কিন্তু কবিতাটি আনুমানিক ১৩০৬ সালে লেখা।

গান ও নাটক বাদ দিয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত কবিতার সংখ্যা প্রায় ১২০০ হইবে। এর আগের সংস্করণ চয়নিকায় তাহার মধ্যে মোট ১৩৬টি কবিতা ছিল; এবার ২০৮টি কবিতা দেওয়া হইল। কবির নূতন প্রকাশিত দুইখানি বই, প্রবাহিণী (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) ও পূরবী (শ্রাবণ, ১৩৩২) হইতেও আমরা কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। কবির অপ্রকাশিত নূতন কবিতাও দু-টি দেওয়া হইল। বর্ত্তমান সংস্করণের আয়তন খুব বাড়িয়াছে, সেই জন্য দামও কিছু বাড়াইতে হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণে আমরা ইচ্ছা করিয়া গান বাদ দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা প্রায় ২০০০ হাজারের কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে; এখন গানের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সংকলন বাহির করা ভিন্ন উপায় নাই। চয়নিকার মধ্যে গুটিকয়েক গান যোগ করিয়া দিয়া পাঠকদিগের আগ্রহ মিটিবে না, অনর্থক আরও কয়েকটি কবিতা বাদ পড়িবে। গানের সংকলন বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে।

শেষে কবির নির্দ্দেশ অনুসারে একটি কথা জানাইতেছি। কবির নিজের ইচ্ছা ছিল না যে "মানসীর" আগেকার (অর্থাৎ ১২৯৩ সালের পূর্ব্বের) লেখা কোনো কবিতা চয়নিকায় স্থান পায়। কবি মনে করেন যে সে সময়ের লেখা অত্যন্ত কাঁচা এবং জন-সমাজে প্রচলিত থাকিবার যোগ্য নয়। এ বিষয়ে বাঙ্‌লা দেশের পাঠকবর্গ কবির সহিত একমত নহেন। আমরা পাঠকবর্গের মত অনুসারেই চয়নিকা সংকলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

ফাল্গুন, ১৩৩২।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা